আমলে শরীয়ত

ও

সহীহ নামায শিক্ষা

❑ লিখেছেন ❑

হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব আবূ দাউদ মুহাম্মদ সাদেক রেযভী (পাকিস্তান)
হযরতুল আল্লামা আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
হযরতুল আল্লামা হাফেজ মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী
হযরতুল আল্লামা কাজী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী

❑ সম্পাদনায় ❑

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

হাদিয়া ঃ **৪০** টাকা মাত্র

১ম প্রকাশ ঃ ১২ রবিউল আউয়াল ১৪১৬ হিজরি; ১০ আগস্ট ১৯৯৫ ইংরেজি
২য় প্রকাশ ঃ ০১ রমজান ১৪২৬ হিজরি; ০৬ আগস্ট ২০০৫ ইংরেজি
৩য় প্রকাশ ঃ ১৫ যিলহজ্ব ১৪২৭ হিজরি; ০৬ জানুয়ারি ২০০৭ ইংরেজি
৪র্থ সংস্করণ ঃ ০১ মহররম ১৪২৯ হিজরি; ০১ জানুয়ারি ২০০৮ ইংরেজি
৫ম সংস্করণ ঃ ১ সফর ১৪৩০ হিজরি; ০১ জানুয়ারি, ২০০৯ ইংরেজি
৬ষ্ঠ সংস্করণ ঃ ৬ সফর ১৪৩২ হিজরি; জানুয়ারী ২০১১ইংরেজি

❑ প্রকাশনায় ❑

আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট
৩২১, দিদার মার্কেট, দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম। ফোন ঃ ৬৩৪২৪১, ৬২৪৩২২, ৮৪৩৮৩৭
ই-মেইল ঃ anjumantrust@yahoo.com, anjumantrust@gmail.com

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

মহান করুণাময় আল্লাহ্ তাবারাকা ওয়া তা'আলার অশেষ মেহেরবাণীতে আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রকাশনা দপ্তর থেকে দ্বীনী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সঙ্কলন নিয়ে 'আমলে শরীয়ত' প্রকাশনার প্রথম পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হয়েছিল ১৯৯৫সালে। জাতীয় জীবনের এ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির আসল উৎস ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, ইসলামী মূল্যবোধ, ধর্মীয় প্রেরণা ও অনুভূতির সঠিক বাস্তবায়ন আমাদের সবারই কাম্য।

আজ অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি রাহনুমায়ে শরীয়ত ও তরীকত হযরতুল আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ সাবির শাহ্ মুদ্দাজিল্লুহুল আলী ও বাংলাদেশ সফরে তাঁর সফরসঙ্গী হিসেবে আগত পাকিস্তানের খ্যাতনামা গবেষক ড.সলিমুল্লাহ্ ওয়াইসীকে। তাঁরা আমাদেরকে উর্দূ ও আরবী ভাষায় রচিত কিছু ইশ্তেহার ও কিতাব প্রদান করে সেগুলোর অনুবাদ করিয়ে বাংলাভাষী মুসলিম সমাজের জন্য নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য দ্বীনীজ্ঞান হাসিলে সহায়ক পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। এ প্রকাশনা-প্রয়াস তাঁদেরই নির্দেশনা বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ ছিল। আনজুমান'র এ প্রয়াস ইনশা-আল্লাহ্ অব্যাহত থাকবে।

এ পুস্তকের প্রথম সঙ্কলনে মোট পাঁচটি বিষয়ে পৃথক পৃথক প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। অতঃপর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রাক্কালে জনাব আলহাজ্ব মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেবকে নতুন করে পান্ডুলিপি তৈরির জন্য অনুরোধ করা হলে তিনি সেটাকে একটি পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা সহকারে প্রকাশের প্রস্তাব দেন এবং পুস্তিকাটির সম্পাদনা করেন। সুতরাং দ্বিতীয় সংস্করণ একটি 'পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা' প্রথম সংস্করণের আমলের সাথে সম্পৃক্ত প্রবন্ধগুলো নিয়ে সাজানো হয়েছে; যা শরীয়তের আমলের বর্ণনায় এ পুস্তককে সার্থক করেছে। এ সংস্করণ প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা ও শ্রম আল্লাহ্ তা'আলা কবূল করুন। আ-মীন, বিহুরমাতি শাফী'ইল মুযনিবীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আরজগুজার-
আলহাজ্ব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন
সেক্রেটারি জেনারেল
আনজুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ وَنُسَلِّمُ عَلٰى حَبِيْبِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ اَجْمَعِيْن

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁরই ইবাদতের জন্য। তিনি ইরশাদ ফরমান وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ অর্থাৎ ''আমি মানুষ ও জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করেছি আমার ইবাদতের জন্যই।'' আমরা অহরহ আল্লাহর নি'মাতরাজিতে ডুবে আছি। একটু চিন্তা করলেই তা আমরা সহজে বুঝতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا অর্থাৎ ''তোমরা যদি আল্লাহ্র নি'মাতগুলোকে গণনা কর তাহলে সেগুলো গণনা করতে পারবে না।'' সুতরাং আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নি'মাতের শুকরিয়া আদায় করতে সচেষ্ট থাকা চাই। তাই সর্বাগ্রে বিশুদ্ধভাবে ঈমান আনা প্রত্যেক মানুষের উপর ফরয। আহলে সুন্নাতের আক্বীদা পোষণ করলেই একমাত্র ঈমান বিশুদ্ধ হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কতগুলো অনিবার্য সোপান রয়েছে। যেমন ভোরে ঘুম থেকে উঠা। তারপর দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ শুরু করা। আর মধ্যাহ্ন পেরিয়ে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ শুরু হয়। তারপর অপরাহ্ন, তারপর সূর্যাস্ত, তারপর সন্ধ্যা ও রাত। আল্লাহ্ পাক আমাদের উপর যেই পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন সেগুলো নিয়মিতভাবে মসজিদে জমা'আত সহকারে সম্পন্ন করলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি সোপান আল্লাহ ও তাঁর রসূল'র নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমেই আরম্ভ হয়।

সুতরাং তখন ফজরের নামাযের মাধ্যমে দিনের সূচনা হবে, যোহরের নামাযের মাধ্যমে আরম্ভ হবে দিনের দ্বিতীয়ার্ধ, তারপর বিশ্রাম শেষে আসরের নামাযের মাধ্যমে দিনের তৃতীয় সোপান আরম্ভ হবে। এভাবে মাগরিবের নামাযের মাধ্যমে শুরু হবে রাতের প্রারম্ভিক সোপান। তারপর এশা ও বিতরের নামায পড়ে দিনের দৈনন্দিন কর্মতৎপরতার সমাপ্তি। এর ফাঁকে ফাঁকে দিনের অন্যান্য অভ্যন্তরীন সোপানগুলোও অন্যান্য নফল নামাযের মাধ্যমে আরম্ভ করা যেতে পারে। যেমন-ইশরাক্ব, দ্বোহা ইত্যাদি। সন্ধ্যায় সালাতুল আওয়াবীন ও রাতে তাহাজ্জুদ ইত্যাদি নামাযেরও বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া, আমাদের প্রতিটি কাজের প্রারম্ভেও নির্দিষ্ট দো'আ ইত্যাদি আবৃত্তি করলে, সাপ্তাহান্তে এবং বছরের নির্ধারিত দিন ও রাতগুলোতে বিশেষ বিশেষ ইবাদতও যথাসময়ে এবং যথানিয়মে সম্পাদন করলে আমরা আল্লাহর হিফাযত, রহমত ও বরকতের মধ্যে স্থান পেতে পারি। সর্বোপরি, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন সেই উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে আমাদের জীবন অতিবাহিত হবে। তখন আমাদের ইহজীবন হবে সার্থক আর পরকালে পাবো আশাতীত সাফল্য তথা জান্নাতের অকল্পনীয় নি'মাতরাজি।

আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ ও তাঁর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ফরয ইবাদতের সাথে সাথে বিশেষ বিশেষ নফল ইবাদতের নিয়মও শিক্ষা দিয়েছেন। সেগুলো কাজে পরিণত করার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় জ্ঞান লাভ করা, সেগুলোর নিয়ম পদ্ধতি ও ফাযাইল সম্পর্কে অবগত হওয়া। সুতরাং, ওই ধরনের কিছু প্রয়োজনীয় বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত এ পুস্তিকা।

-সম্পাদক

p§¢Qfœ

১.	**আক্বীদা**	১
২.	**কলেমা**	৫
৩.	**পবিত্রতা ও নামায**	৭
	গোসলের পদ্ধতি	১০
	ওযূর বর্ণনা	১২
	ওযূর সুন্নাতসমূহ	১৩
	ওযূর মুস্তাহাবসমূহ	১৩
	কি কি কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়	১৩
	কি কি কারণে ওযূ মাকরূহ হয়	১৪
	ওযূ করার পদ্ধতি	১৪
৪.	**তায়াম্মুম**	১৫
৫.	**নামায**	১৬
	নামাযের পূর্বশর্তসমূহ	১৬
	নামাযের আরকান	১৬
	নামাযের ওয়াজিবসমূহ	১৬
	নামাযের পদ্ধতি	১৭
	মহিলার নামায	২১
	কি কি কারণে নামায ভঙ্গ হয় ?	২২
	কি কি কারণে নামায মাকরূহ-ই তাহ্রীমী হয়	২৩
	কি কি কারণে নামায মাকরূহ-ই তান্যীহী হয়	২৩
৬.	**নামাযের জন্য কতিপয় সূরা**	২৪
৭.	আয়াতুল কুরসী	২৭
৮.	সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার	২৮
৯.	সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত	২৮
১০.	রাতে শয়নের পূর্বে পড়ার দোয়া	২৯
১১.	রাতে ঘুমানোর সুন্নাতসম্মত নিয়ম	৩০
১২.	**আযান**	৩১
	আযানের দো'আ	৩১
১৩.	**তাশাহ্হুদ** (আত্তাহিয়্যা-তু)	৩২
১৪.	দরূদ-ই ইব্রাহীমী শরীফ	৩২
১৫.	দো'আ-ই মা'সূরা	৩২
১৬.	দো'আ-ই কুনূত	৩৩
১৭.	সালাম ফেরানোর পর দো'আ ও মুনাজাত	৩৪
১৮.	**নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব**	৩৪

১৯. **নামাযের প্রকার ভেদ** ৩৪

২০. **পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম ও সময়** ৩৫

নামাযগুলোর উত্তম ওয়াক্ত ৩৬

২১. **নামাযের নিয়্যতসমূহ** **৩৭**

২২. **জুমু'আর নামায** ৪২

২৩. **ক্বাযা নামায** ৪৫

ক্বাযা নামাযের নিয়ম ৪৫

ক্বাযা নামাযের নিয়্যত ৪৫

২৪. **সাজ্‌দাহ্-ই সাহ্‌ভ** ৪৬

২৫. শবে বরাতের নামায ৪৬

২৬. **রোযা** **৪৭**

রোযার নিয়্যত ৪৭

ইফ্‌তারের নিয়্যত ৪৭

২৭. তারাভীহ্ ৪৮

তারাভীহ্ নামাযের নিয়্যত ও দো'আসমূহ ৪৮

২৮. শবে ক্বদ্‌রের নামায ৪৯

২৯. **ই'তিক্বাফ** ৫০

৩০. ঈদুল ফিত্‌রের নামায ৫০

৩১. ঈদুল আদ্‌হার নামায ৫১

৩২. উভয় ঈদের নামাযের নিয়ম ৫১

৩৩. **কতিপয় নফল রোযার বিবরণ** ৫২
('আশূরা, আরফাহ্, আইয়্যাম-ই বীদ্ব, সোম ও বৃহস্পতিবার, বুধ ও বৃহস্পতিবার, শাওয়ালের ছয় রোযা এবং শা'বানের রোযা)

৩৪. **জানাযার নামায** ৫৪

কবর যিয়ারত ৫৬

যিয়ারতের নিয়ম ৫৬

কবর তালক্বীন ও এর পরবর্তী দো'আ ৫৬

ইসক্বাত ৫৮

৩৫. **কতিপয় নফল নামাযের বিবরণ** ৫৮

তাহিয়্যাতুল ওযূ ৫৮

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ ৫৯

ইশ্‌রাক্বের নামায ৫৯

চাশ্‌তের নামায ৬০

সালাতুল আওয়াবীন ৬০

তাহাজ্জুদের নামায ৬১

সালাতুত্ তাসবীহ ৬১

সালাতুল হাজত ৬২

সালাতুল আসরার বা নামাযে গাউসিয়া ৬৩

তাওবার নামায ৬৪

নামায-ই সফর ও সফরের মাসাইল ৬৪

ইস্তিখারার নামায ৬৬

সূর্যগ্রহণ (কুসূফ)-এর নামায ৬৭

চন্দ্রগ্রহণ (খুসূফ)-এর নামায ৬৭

ইস্তিস্ক্বার নামায ৬৮

৩৬. **দরূদ-ই তাজ :** ৬৮

তাৎপর্য ও ফযীলত ৭০

রচয়িতার অসাধারণ ইশ্‌ক্বে রসূল ৭০

দরূদ-ই তাজ শরীফের কতিপয় পরীক্ষিত উপকারিতা ৭১

৩৭. **যিয়ারতের মাসাইল** **৭২**

যিয়ারতের ভিত্তি (ক্বোর্‌আন ও হাদীস) ৭২

যিয়ারতের ফযীলত ৭৩

যিয়ারতের সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি ৭৪

যিয়ারতে যা পড়বেন ৭৪

যিয়ারতের মুনাজাত আরবী ভাষায় ৭৫

যিয়ারতের সময় ৭৫

বরকতময় দিবসসমূহে যিয়ারত ৭৬

মাতাপিতার কবর যিয়ারত ৭৬

সর্বসাধারণ মুসলমানদের কবর যিয়ারত ৭৭

নবী ও ওলীগণের যিয়ারত ৭৮

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত ৭৮

যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্ ৮০

৩৮. **হযরত গাউসুল আ'যম ও গেয়ারভী শরীফ** ৮২

আত্মা-ই ইলাহী ৮২

আত্মা-ই মুস্তফা ৮৩

আত্মা-ই হায়দারী ৮৩

সন্দেহের অপনোদন ৮৩

'শায়খ', 'ক্বুত্‌ব' ও 'গাউস'-এর ব্যাখ্যা ৮৪

গাউসে পাকের মর্যাদা ও কারামাত ৮৭

গেয়ারভী শরীফ ৮৯

গেয়ারভী শরীফ বৈধতার প্রমাণাদি ৯২

আক্বীদা

ইসলামের বুনিয়াদ ৫টি ঃ ১. ঈমান, ২. নামায, ৩. যাকাত, ৪. হজ্ব ও ৫. রমজানের রোযা। হযরত ইবনে ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান **بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)** অর্থাৎঃ ‘‘ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটির উপর প্রতিষ্ঠিত ঃ এ মর্মে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল, নামায প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত প্রদান করা, হজ্ব করা ও রমযান মাসের রোযা পালন করা।’’ [বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত শরীফ পৃষ্ঠা ১২]

ইসলামের এ পঞ্চ বুনিয়াদ সম্পর্কে বুঝার জন্য, যদি ইসলামকে একটা তাঁবু কল্পনা করা হয়, তবে তাঁবু স্থির থাকার জন্য পাঁচটি খুঁটি থাকা আবশ্যক। তন্মধ্যে চারটি চার কোণায় এবং মধ্যভাগে একটি। উল্লেখ্য, ওই মধ্যভাগের খুঁটি বা স্তম্ভটি হচ্ছে প্রধানতম। সেটা ছাড়া তাঁবুর অস্তিত্বই কল্পনা করা যায়না। আর চার কোণার চারটির মধ্যে কোন একটির অনুপস্থিতি ঘটলে কিংবা নষ্ট হয়ে গেলেও তাঁবু নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং ঈমান হচ্ছে- তাঁবুর মধ্যবর্তী খুঁটির মতই। বিশুদ্ধ ঈমান ছাড়া কারো মধ্যে ইসলাম থাকার কল্পনা করাও অনর্থক। অন্য ভাষায় ঈমান তথা আক্বীদার বিশুদ্ধিই কোন মুসলমানের অন্যান্য আমল আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবার পূর্বশর্ত। আর বাকী চারটি স্তম্ভ- নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা ওই ইসলামরূপী তাঁবুর চারটা স্তম্ভ স্বরূপ। বিশুদ্ধ ঈমানের সাথে সাথে এ চারটি বুনিয়াদী আমল না করলেও কারো ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়না। এ কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন **اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ فَمَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ** অর্থাৎ নামায হচ্ছে দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ। সুতরাং যে নামায কায়েম রেখেছে সে দ্বীনকে কায়েম রেখেছে। আর যে নামায বর্জন করেছে সে দ্বীনকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান বা আক্বীদা বিশুদ্ধ হয়না ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মুসলমানের কোন আমল বা ইবাদত-বন্দেগী কবুল হয়না। এখানে প্রশ্ন জাগে বিশুদ্ধ আক্বীদা বলতে কি বুঝায়? এর জবাব হচ্ছে একমাত্র ‘আহলে সুন্নাত ওয়া জামা‘আত’-এর আক্বীদা (সুন্নী মতাদর্শ) হচ্ছে ওই একমাত্র কাঙ্খিত আক্বীদা। কারণ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে সতর্ক করে এরশাদ করেছেন, ‘‘বনী ইস্রাঈল বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত ছিল। অবিলম্বে আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর ফির্কা বা দলে। তাদের মধ্যে ৭২ ফির্কা বা দল হচ্ছে জাহান্নামী একটি মাত্র দল ব্যতীত। আর ওই নাজাতপ্রাপ্ত সত্যদল হচ্ছে সুন্নী জামা‘আত। [হাদীস শরীফ এবং এর ব্যাখ্যাগ্রন্থাদি ও আক্বাঈদ বিষয়ক কিতাবাদি দ্রষ্টব্য]

কাজেই, এ ক্ষেত্রে সুন্নী আক্বীদা ও এর সঠিক আদর্শ অনুসারে আমল সম্পর্কে জানা, বুঝা ও আমল করার জন্য একমাত্র সহজ উপায় হচ্ছে খাঁটি সুন্নী মতাদর্শের মাদরাসা ও এ আদর্শের সঠিক পথ প্রদর্শক সহীহ মুর্শিদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। পীরে কামেল, মুর্শেদে বরহক্ব, রাহ্নুমায়ে শরীয়ত ও তরীক্বত হযরতুল আল্লামা হাফেয ক্বারী সৈয়্যদ আহমদ শাহ্ সিরিকোটী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরী হুযূর ক্বেবলা আল্লামা হাফেজ ক্বারী সৈয়্যদ মুহাম্মদ তৈয়্যব শাহ্ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং তদীয় সুযোগ্য উত্তরসূরী হুযূর ক্বেবলা আল্লামা সৈয়্যদ মুহাম্মদ তাহের শাহ্ মুদ্দাযিল্লুহুল আলী’র অসাধারণ বেলায়তী প্রজ্ঞামন্ডিত সিলসিলাহ্-ই আলিয়া ক্বাদেরিয়া সিরিকোটিয়া এবং তাঁদেরই যথাক্রমে প্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত আন্জুমান-এ-রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়ার প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠান, জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া (চট্টগ্রাম) ও জামেয়া কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া আলিয়া (মোহাম্মদপুর, ঢাকা) ইত্যাদি মাদরাসা, গাউসিয়া কমিটি, আহলে সুন্নাত ওয়া জামা‘আতের খাঁটি ও বিশুদ্ধ সুন্নী তরীক্বাহ বা সিলসিলাহ্ এবং দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুতরাং এ ফিত্না-ফ্যাসাদের গোলকধাঁধার যুগে এ বিশুদ্ধ তরীক্বাহ্ ও দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াই আমরা মুক্তির সহজতম উপায় মনে করি ও তজ্জন্য পরামর্শ দিচ্ছি।

এখন, ইসলামী আক্বীদার কয়েকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রয়াস পেলাম। ইসলামের নির্দেশনা অনুসারে প্রতিটি মুসলমানকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে বিশুদ্ধভাবে বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য:

আল্লাহ্ তা‘আলা

মুসলমানদের সর্বপ্রথম বিশ্বাস করতে হয় আল্লাহ্ তা‘আলাকে। তিনি নিরাকার। এ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন তিনি। প্রতিপালনও করেন তিনি। আবার অবসানও ঘটবে তাঁর নির্দেশে। অসীম-অতুলনীয় শক্তির আধার তিনি। তাঁর তুল্য কেউ নেই। তিনি সকলের স্রষ্টা, আর সবই তাঁর সৃষ্টি। তিনি অনাদি, অনন্ত ও চির বিরাজিত। তাঁর মৃত্যু নেই, তাঁর নিদ্রা এবং তন্দ্রাও নেই। কেউ তাঁর জনক নয়, তিনিও কারো জনক নন। ভবিষ্যৎ, বর্তমান, গুপ্ত, প্রকাশ্য সবই তিনি জানেন। তিনিই সকলের একমাত্র উপাস্য। তিনি সম্পূর্ণ দোষ-ত্রুটিমুক্ত ও পবিত্র। তিনি সমস্ত ভালগুণের ধারক। আল্লাহর অস্তিত্ব, চিরস্থায়িত্ব, একত্ব ও সমস্তগুণে বিশ্বাস করা প্রকৃত মু’মিন-মুসলমানের মূল পরিচয়।

ফিরিশতা

ফিরিশতা আল্লাহ্ পাকের এক নূরানী সৃষ্টি। তাঁরা না পুরুষ। না স্ত্রী। তাঁরা পানাহার করেন না। তাঁরা জৈবিক চাহিদামুক্ত। তাঁরা বিভিন্ন আকৃতি ধারণে সক্ষম। দিবারাত্রি ফিরিশতাগণ আল্লাহর হুকুম তামিলে রত। তাঁদের সংখ্যা- দুনিয়ার মানব, জিন্ এবং অন্যান্য সব জীব-জন্তুর সম্মিলিত সংখ্যা অপেক্ষাও অধিক।

এদের মধ্যে চারজন ফিরিশতা প্রধান। যথা-

১. হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম
২. হযরত মীকাঈল আলাইহিস্ সালাম
৩. হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালাম
৪. হযরত আয্রাঈল আলাইহিস্ সালাম

১. হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম- এর সম্মান ও মর্যাদা সর্বাপেক্ষা অধিক। তিনি আল্লাহর নির্দেশসমূহ নবী-রসূলগণের নিকট পৌঁছিয়ে দিতেন। আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আখেরী পয়গাম্বর। তাঁর পরে আর কোন নবী বা রসূল দুনিয়াতে আসেননি এবং আসবেনও না। সুতরাং তাঁর পরে জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আর আল্লাহর বিধান নিয়ে আগমন করেননি, করবেনও না। অতএব, এখন হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর নির্দেশিত অন্যান্য কর্তব্য পালনে নিযুক্ত আছেন।

২. হযরত মীকাঈল আলাইহিস্ সালাম আল্লাহর হুকুমে মানুষের রুজি-রোযগার বন্টন করেন। বৃষ্টি, বাতাস, পানি প্রভৃতির পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণের ভারও তাঁর উপর ন্যাস্ত।

৩. হযরত ইস্রাফীল আলাইহিস্ সালাম প্রকাণ্ড এক শিঙ্গা মুখে নিয়ে আল্লাহ্র হুকুমের অপেক্ষা করছেন। যে মুহূর্তে আল্লাহ্ হুকুম করবেন, তখনই তিনি শিঙ্গায় ফুৎকার করবেন। ওই ফুৎকারেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।

৪. হযরত আয্রাঈল আলাইহিস্ সালাম-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলা জীবজগতের জান কব্জের (মৃত্যু ঘটানোর) দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। তিনি তাঁর অধীনস্থ ফিরিশতাগণসহ জীবজগতের জান কবজ করেন। এভাবে ক্বিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন। পরিশেষে এক পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশে তাঁর জানও তিনি নিজে হনন করবেন ।

আসমানী কিতাব

আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন স্বীয় বান্দাগণকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য নবী-রসূলগণের প্রতি বিধি-নিষেধ সম্বলিত যে গ্রন্থসমূহ অবতীর্ণ করেছেন সেই পবিত্র গ্রন্থগুলোই ধর্মগ্রন্থ বা আসমানী কিতাব অথবা সহীফা ও কিতাব নামে অভিহিত। এ সহীফা ও কিতাবসমূহের প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য। রসূলগণের প্রতি এ জাতীয় বহু সহীফা ও গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে। এ গ্রন্থসমূহের মধ্যে ৪টি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

১. তাওরীত ঃ হযরত মূসা আলাইহিস্ সালাম'র উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
২. যাবূর ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস্ সালাম'র উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
৩. ইনজীল ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম'র উপর অবতীর্ণ হয়েছে।
৪. ক্বোরআনঃ এ মহান গ্রন্থটি সর্বশেষ নবী ও রসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে।

উল্লিখিত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের মধ্যে ক্বোরআনই প্রধান ও সর্বোৎকৃষ্ট। উল্লেখ্য যে, এ কিতাবের মাধ্যমে পূর্ববর্তী অন্য সকল গ্রন্থের বিধিসমূহ মানসূখ বা রহিত হয়ে গেছে।

নবী ও রসূল

আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় ধর্ম ও বিধান মানব সমাজে প্রচার করার জন্য যাঁদেরকে যুগে যুগে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছিলেন তাঁরাই রসূল ও নবী, অন্য ভাষায় পয়গাম্বর নামে পরিচিত। নবী-রসূলগণের উপর ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই, তফাৎ শুধু মর্যাদার মধ্যে। আল্লাহ্ তা'আলা যাঁদের প্রতি ধর্মগ্রন্থ বা আসমানী কিতাব ও স্বতন্ত্র শরীয়ত নাযিল করেছেন তাঁরাই রসূল; আর যাঁদের প্রতি আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়নি, তাঁরা নবী। নবীগণের সঠিক সংখ্যা বলা যায় না। তবে অনেকে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবী প্রেরণ করেছেন। তন্মধ্যে ৩১৩ জন রসূল। দুনিয়ায় নবী ও রসূলগণের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হলেন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম এবং সর্বশেষ আমাদের আক্বা ও মাওলা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উল্লেখ্য যে, আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীতে চূড়ান্ত পর্যায়ে সবশেষে তাশরীফ আনলেও তিনি হলেন সর্বপ্রথম সৃষ্টি ও সমস্ত সৃষ্টির মূল। তিনি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট আর সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নূর থেকে মহান আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তিনি তখনও নবী ছিলেন যখন হযরত আদম আলাইহিস্ সালাম সৃষ্টির উপাদানগুলোতেই ছিলেন।[বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ]

ইল্মে গায্ব

ইল্মে গায্ব (অদৃশ্যের জ্ঞান) দুই প্রকার: ১.যাতী ও ২.আত্বাঈ। (যথাক্রমে, সত্ত্বাগত ও দানগত।) সত্ত্বাগত অদৃশ্য জ্ঞান আল্লাহ্ পাকের জন্য খাস। আর তিনি যাঁকে চান অদৃশ্যের জ্ঞান দান করেন; এটাই হচ্ছে ইল্মে আত্বাঈ বা দানগত অদৃশ্যজ্ঞান। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ পাক নিঃসন্দেহে ইল্মে গায্ব দান করেছেন এবং অন্যান্য নবীগণকেও। [আল্-ক্বোরআন, ৪র্থ পারা, ৯ম রুকু' ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য]

এ ছাড়াও ক্বিয়ামত ইত্যাদি আরো বহু আক্বীদা সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে। পরিসরের স্বল্পতা হেতু এখানে উল্লেখ করা হল না।

ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী ঈমান বা বিশ্বাসের ঘোষণাকে সাধারণতঃ দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। একটি 'সংক্ষিপ্ত' অপরটি 'বিস্তারিত'। সংক্ষিপ্তটিকে বলা হয় 'ঈমানে মুজমাল'। তা এভাবে-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লা-হি কামা- হুয়া বিআসমা-ইহী ওয়া সিফা-তিহী ওয়া

ক্বাবিলতু জামী'আ আহকা-মিহী ওয়া আরকা-নিহী।

অর্থাৎ আল্লাহর উপর তাঁর যাবতীয় নাম ও গুণ সহকারে ঈমান আনলাম তেমনিভাবে, যেমনটি তাঁর জন্য শোভা পায় এবং মেনে নিলাম তাঁর নির্দেশ ও বিধানগুলোকে।

বিস্তারিতটিকে বলা হয় 'ঈমানে মুফাস্সাল'। তা নিম্নরূপ-

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ۔

উচ্চারণ ঃ আ-মানতু বিল্লা-হি ওয়া মালা-ইকাতিহী ওয়া কুতুবিহী ওয়া রুসুলিহী ওয়াল ইয়াওমিল আ-খিরি ওয়াল ক্বদরি খয়রিহী ওয়া শার্‌রিহী মিনাল্লা-হি তা'আ-লা ওয়াল বা'সি বা'দাল মাওত।

অর্থাৎ আল্লাহ্, তাঁর ফিরিশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসূলগণ, বিচার দিবস, অদৃষ্টের ভাল-মন্দ তাঁরই নিকট হতে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি আমি ঈমান আনলাম।

অন্যান্য কালেমা

ধর্ম-বিশ্বাসের বাক্য ও বাক্যসমষ্টিকে কালেমা বলা হয়। এই কালেমাগুলোর উচ্চারণ বা পাঠই হল আন্তরিক ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। কালেমা প্রধানতঃ ৫টি। নিম্নে ওই পাঁচ কালেমা উল্লেখ করা হল:

১. কালেমা তাইয়্যেব (উত্তম বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লাহ্।

অর্থঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই, 'মুহাম্মদ' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল।

২. কালেমা-ই শাহাদাত (সাক্ষ্য বাক্য)

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ

وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

উচ্চারণ ঃ আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ আবদুহূ ওয়া রসূ-লুহূ।

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় বান্দা ও রসূল।

৩. কালেমা-ই তাওহীদ (আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসের বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَاحِدًا لَّاثَانِيَ لَكَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ رَسُوْلُ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা ওয়া-হিদাল লা- সা-নিয়া লাকা মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হি ইমামুল মুত্তাক্বী-না রসূ-লু রব্বিল আ'-লামীন।

অর্থ ঃ (হে মা'বূদ) তুমি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি একক, অদ্বিতীয়। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসূল, ধর্মভীরুদের ইমাম ও বিশ্বরবের প্রেরিত।

৪.কালেমা-ই তামজীদ (আল্লাহ্র সম্মান ও গুণবাচক বাক্য)

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ نُوْرًا يَّهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اِمَامُ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলা-হা ইল্লা-আনতা নূ-রাইঁ ইয়াহ্দিল্লা-হু লিনূ-রিহী মাইঁ ইয়াশা-উ, মুহাম্মাদুর রসূ-লিল্লা-হি ইমামুল মুরসালী-না ওয়া খা-তামুন্ নাবিয়্যী-ন।

অর্থ ঃ (হে মা'বূদ) তুমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। তুমি জ্যোতির্ময়। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা নূরের দিকে চালিত করেন। আল্লাহর প্রেরিত হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রসূলগণের ইমাম এবং নবীগণের মধ্যে সর্বশেষ।

৫. কালেমা-ই রদ্দে কুফর (কুফর খণ্ডন বাক্য)

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْٓ اَعُوْذُبِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا اَنَا اَعْلَمُ بِهٖ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا اَعْلَمُ بِهٖ وَمَا لَآ اَعْلَمُ بِهٖ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْمَعَاصِىْ كُلِّهَا وَاَسْلَمْتُ وَاٰمَنْتُ وَاَقُوْلُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ۔

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊ-যুবিকা মিন আন্ উশ্রিকা বিকা শাইআওঁ ওয়া আনা আ'লামু বিহী, ওয়াস্তাগ্ফিরুকা লিমা আ'লামু বিহী ওয়া মা- লা-আ'লামু

☆উল্লেখ্য, নিম্নলিখিত কালেমা দুটিকেও যথাক্রমে 'কলেমা-ই তাওহীদ' ও 'কলেমা-ই তামজীদ' বলা হয় :

কলেমা-ই তাওহীদ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

কলেমা-ই তামজীদ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

বিহী তুবতু আনহু ওয়া তাবার্‌রা'তু মিনাল কুফ্‌রি ওয়াশ্‌ শির্‌কি ওয়াল মা'আ-সী কুল্লিহা, ওয়া আসলামতু ওয়া আ-মানতু ওয়া আক্বূ-লু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু মুহাম্মাদুর রসূ-লুল্লা-হ্‌।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যেন আমার জানা মতে কাউকেও তোমার সাথে অংশীদার না করি। আমার জানা-অজানা গুনাহ্‌ হতে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তা থেকে তাওবা করছি। কুফর, শির্‌ক ও অন্যান্য সমস্ত গুনাহ্‌ হতেও পবিত্র থাকছি এবং মেনে নিয়েছি ও মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছি যে, আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহ্‌র রসূল।

পবিত্রতা ও নামায

পবিত্রতা ও নামায ইসলামের অন্যতম দু'টি অঙ্গ। বিভিন্নভাবে মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা এ দুটি বিষয়ে পবিত্র ক্বোরআন মজীদে আলোচনা করেছেন। যেমন তিনি এরশাদ করেছেন- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ (নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তাওবাকারীদের এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালবাসেন)। অন্যত্র এরশাদ করেছেন- فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ(অতঃপর অনিষ্ট ওই নামাযীদের জন্য, যারা নিজেদের নামাযকে ভুলে থাকে)। পবিত্র কালামে মজীদে মহান রব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন- قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ (নিশ্চয় ওই সমস্ত মু'মিন সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে বিনয়ী)। অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে- اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ (কিন্তু, ওই সব নামাযী, যারা নিজেদেরকে সর্বাবস্থায় নামাযে বিদ্যমান রাখে)। তিনি অন্যস্থানে এরশাদ করেন- وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ (আর যারা নিজেদের নামাযের প্রতি যত্নবান)। উল্লিখিত পবিত্র আয়াতসমূহ দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হল যে, ইহ ও পরকালীন সফলতা ও কল্যাণের জন্য পাঁচ ওয়াক্বত নামায অবশ্যই প্রয়োজন।

মূলতঃ শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ নামায হল যা বিনয়, নম্রতা এবং পরিপূর্ণ ইখ্‌লাস সহকারে আদায় করা হয়। তাই পাঁচ ওয়াক্বত নামায আদায় করার জন্য নামাযের আরকান-আহকাম এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসাইল ভালভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। সাথে সাথে এও জেনে নেওয়া প্রয়োজন যে, যেভাবে সফলতার জন্য পাঁচ ওয়াক্বত নামায প্রয়োজন, তেমনিভাবে নামাযের জন্য পবিত্রতা এবং পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতাও আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবির রদ্বিয়াল্লাহু আন্হু'র হাদীস শরীফটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, প্রিয়নবী রঊফুর রহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "নামায হচ্ছে বেহেশ্‌তের চাবি, আর পবিত্রতা হচ্ছে নামাযের হচ্ছে চাবি।" কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে,

---

* লিখক : আল্লামা আবূ দাঊদ মুহাম্মদ সাদেক রেজভী

অনুবাদক : হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ সুলায়মান আনসারী [বর্ধিত কলেবরে সম্পাদিত]

অধিকাংশ অহঙ্কারী বে-নামাযী লোক এর হাক্বীক্বত তথা মূল রহস্য সম্পর্কে জানে না। আর জানলেও অসম্পূর্ণতা ও উদাসীনতার কারণে নামাযের পরিপূর্ণ সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়। আবার কতেক মহিলা ও পুরুষ নামাযী নামায ও পবিত্রতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না হওয়ার কারণে নামাযের পরিপূর্ণ সাওয়াব হতে বঞ্চিত হয়। এ জন্যই নামায ও পবিত্রতা সম্পর্কীয় জরুরী মাসআলা-মাসাইল এখানে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে, যা দ্বারা অপবিত্র পবিত্র হবে এবং নামাযী তার নামাযসমূহ পরিশুদ্ধ করে জান্নাতের চাবি লাভ করার উপযোগী হবে।

কিছু প্রয়োজনীয় কথা ঃ উপরে বর্ণিত হাদীসে নববীতে 'মিফতাহ্‌' বা চাবি শব্দটি দ্বারা নামাযের গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে। এ জন্য যে, যেমন মানুষ চাবি ব্যতীত নিজের ঘর ও দোকান ইত্যাদিতে প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি জান্নাতে প্রবেশের জন্য চাবি হচ্ছে নামায। নামায ব্যতীত জান্নাতে কিভাবে প্রবেশ করবে? আর নামায না পড়া কিংবা বিনষ্ট হবার কারণে বেহেশত হতে বঞ্চিত হয়ে দোযখের শাস্তিও কীভাবে সহ্য করবে? জনৈক কবি কতই সুন্দর লিখেছেন-

ہے سوچنے کی بات ☆ اِسے بار بار سوچ

অর্থাৎ এ'তো চিন্তার কথা! সুতরাং বার বার চিন্তা কর।

নামায এবং পবিত্রতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক দ্বারা প্রমাণিত হল যে, নামায মানুষকে ভিতর ও বাইরে পবিত্র করে। আর যেহেতু নামায থেকে বঞ্চিত হওয়া মানেই বিশুদ্ধ পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত হওয়া, সেহেতু বে-নামাযী ও অপবিত্র ব্যক্তির জীবন একজন মুসলমানের জীবন হতে পারে না, বরং পশু ও কাফিরের মত অপবিত্র ওই জীবন। যেমন অধিকাংশ বে-নামাযী মহিলা ও পুরুষ, পায়খানা-প্রস্রাব থেকে ভালভাবে পবিত্রতা অর্জন করে না। পশ্চিমা স্টাইলে পুরুষরা দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করে এবং মহিলারা নেইল পলিশসহ এমন ধরনের মেকআপ বা প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহার করে, যার ফলে শরীরের সে অঙ্গে পানি না পৌঁছার কারণে পূর্ণ পবিত্রতা অর্জিত হয় না। ফলে, তার নামায হয় না; বরং ওই সমস্ত মেকআপকারী নারী-পুরুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে নামাযী এবং পবিত্রতা অর্জনকারীই হয় না। আল্লাহ্‌ রক্ষা করুন। আ-মীন।

ভোর থেকে

ফজরের আযানের সাথে সাথে ঘুম থেকে জেগে উঠবেন। তখন খুব অলসতার সময়। শয়তান এ সময়টিতে নানাভাবে ঘুম পাড়াতে সচেষ্ট থাকে যেন ফজরের নামায হাতছাড়া হয়ে যায়। তাতে সে সফলকাম হতে পারলে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে শেষ পর্যন্ত তার কানে প্রস্রাব করে দিয়ে চলে যায়। কাজেই সময়টিতে নিজের নাফ্‌স ও শয়তানের বিরোধিতা করে, কাল বিলম্ব না করে নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে পড়তে বিছানা ত্যাগ করবেন-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْر

উচ্চারণ ঃ আলহামদু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্‌য়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া

ইলায়হিন্ নুশূ-র।
তারপর টয়লেটে প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং প্রবেশ করার সময় পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُبِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِث

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আ'ঊ-যুবিকা মিনাল খুবসি ওয়াল খাবা-ইস্।
টয়লেট থেকে প্রথমে ডান পা দিয়ে বের হয়ে পড়বেন-

غُفْرَانَکَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اَذْهَبَ عَنِّیْ
مَایُؤْذِیْنِیْ وَاَمْسَکَ عَلَیَّ مَا یَنْفَعُنِیْ

উচ্চারণ ঃ গুফরা-নাকাল হামদু লিল্লা-হিল্লাযী- আযহাবা 'আন্নী- মা ইয়ূ-যী-নী- ওয়া আমসাকা আলাইয়্যা মা ইয়ানফা'উনী-।
তারপর ওযূ করবেন। ওযূর বিবরণ সামনে আসছে।

পবিত্রতার্জন সম্পর্কে আরো কিছু কথা

পায়খানা-প্রস্রাবের জন্য টয়লেটে প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। বের হওয়ার সময় ডান পা প্রথমে দিয়ে বের হতে হয়। পায়খানা-প্রস্রাব করার সময় এবং ইসতিনজা তথা পবিত্রতা অর্জন করার সময় ক্বেবলা শরীফকে সামনে কিংবা পেছনে রাখা যাবে না। এ বিধান সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য- চাই খোলা ময়দান বা জঙ্গলে হোক কিংবা দেওয়াল বেষ্টিত ঘরে হোক। যদি ভুলক্রমে ক্বেবলার দিকে মুখ কিংবা পিঠ রেখে হাজত সেরে থাকে, তবে মনে পড়ার সাথে সাথে দিক পরিবর্তন করে নিতে হবে। যে মসজিদ বা ঘরের টয়লেট ক্বেবলামুখী কিংবা পেছনমুখী হয়, তা হলে তাৎক্ষণিকভাবে দিক পরিবর্তন করে ফেলেতে হবে। এ মাসআলাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ অবহিত নয়, কিংবা উদাসীন। ছোট ছেলে-মেয়েকে পায়খানা- প্রস্রাব করানোর সময় যদি ক্বিবলামুখী কিংবা ক্বেবলা পেছনে রেখে করানো হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে। এভাবে পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। যদি ছোট ছেলেকেও স্বর্ণের আংটি বা চেইন পরানো হয়, তাহলে ওই ব্যক্তি গুনাহ্গার হবে, শিশু গুনাহ্গার হবে না। যেহেতু শিশু এখনো মুকাল্লাফ তথা শরীয়তের বিধানাবলীর আওতাভুক্ত হয়নি। খালি মাথায় পায়খানা -প্রস্রাবখানায় যাওয়া অথবা এমন বস্তু হাতে রাখা, যা'তে কিছু লাগার সম্ভাবনা থাকে অথবা হাতে আংটি থাকা অথবা ওখান থেকে কথা-বার্তা বলা- সবই নিষেধ, অপছন্দনীয় (মাকরূহ)। পায়খানা-প্রস্রাব এক সাথে হলে ঢিলা-কুলূক ব্যবহার করা সুন্নাত। তবে শুধু পানি দ্বারা পরিস্কার করলেও যথেষ্ট হবে। কিন্তু পছন্দনীয় পদ্ধতি হচ্ছে ঢিলা-কুলূক ব্যবহার করার পর পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। কাগজ দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা নিষেধ; যদিও এতে কোন লেখা না থাকে; এমনকি যদি আবূ জাহলের নামও

থাকে তবুও নিষেধ। ডান হাত দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা মাকরূহ। যদি কারো বাম হাত অকেজো হয়, তাহলে বৈধ। ঝমঝম কূপের পানি দিয়ে ইসতিনজা করা মাকরূহ।

সাবধানতা! প্রস্রাব কিংবা পায়খানা করার সময় কাপড় একেবারে তুলে ফেলা নিষেধ। এমনভাবে পায়খানা-প্রস্রাব করতে হবে যাতে কেউ না দেখে এবং প্রস্রাবের ছিটকে গায়ে না লাগে এবং গুরুত্বসহকারে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে। বড়দের মত ছোটদের প্রস্রাবও অপবিত্র। এ থেকে বেঁচে থাকা খুবই প্রয়োজন। এভাবে যদি দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধ বমি করে দেয়, যদিওবা তা মুখেই ছিল, তবুও তা নাপাক।

গোসলের বর্ণনা ঃ যদি কারো গোসলের প্রয়োজন হয়, তাহলে সে গোসল করে নেবে। বিভিন্ন কারণে গোসল ফরয হয়। যেমন- লিঙ্গ থেকে ধাতু/বীর্য পূর্ণ উত্তেজনা সহকারে পৃথক হলে, পুরুষাঙ্গ যৌনাঙ্গে প্রবেশ করলে গোসল ফরয হবে, যদিও বীর্য নির্গত না হয়। ঘুম থেকে জেগে যদি কাপড়ে বীর্যের চিহ্ন দেখা যায় কিংবা ভেজা থাকে, আর সে চিহ্ন যদি বীর্য (যা সঙ্গমের সময় বা পরে বের হয়) কিংবা মযী (যা সঙ্গমের পূর্বে নির্গত হয়) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে তাতে গোসল ফরয হবে; যদিও স্বপ্নের কথা মনে না থাকে। এ তিন কারণে গোসল ফরয হয়।
এছাড়াও মেয়েদের ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হলে এবং নিফাস (প্রসবোত্তর রক্তক্ষরণ) থেকে পবিত্র হলেও গোসল জরুরী হয়।

গোসলের পদ্ধতি

গোসলের তিনটি ফরয রয়েছে। ১. এভাবে কুল্লি, করা যাতে ঠোঁট, জিহ্বা এবং কণ্ঠনালীর কিনারা পর্যন্ত মুখের সম্পূর্ণ স্থানে পানি পৌঁছে। যদি দাঁতে কোন কিছু লেগে থাকে তাহলে তা ভালভাবে পরিস্কার করা প্রয়োজন, যদি পরিস্কার করতে কোন ক্ষতি কিংবা কষ্ট না হয়। ২.নাকে পানি দেওয়া, এমনভাবে যাতে, নাকের ছিদ্রের নরম অংশে পানি পৌঁছে, যাতে করে ওই স্থানের লোম ও অন্য কিছু থাকলে তাও পরিস্কার হয়ে যায়। এক কথায় নাকের ভিতরে ভাল করে পরিস্কার করে পানি পৌঁছাতে হবে। ৩.সমস্ত শরীর ভালভাবে ধৌত করা। এমনভাবে ধৌত করতে হবে, যাতে পানি মাথার তালু থেকে পায়ের নিচে পর্যন্ত শরীরের প্রত্যেক পরতে পরতে পৌঁছে, যাতে শরীরের প্রতিটি লোমকূপে পানি পৌঁছে যায়। একটি লোমও যাতে শুকনো না থাকে। যদি একটি লোম পরিমাণ জায়গাও শুকনো থাকে, তাহলে গোসল শুদ্ধ হবে না। যদি নাভীর নিচের লোমে পানি পৌঁছার ব্যাপারে সন্দেহ হয়, তাহলে সেখানে হাত দিয়ে ভালভাবে পানি পৌঁছাতে হবে।
উল্লিখিত ফরযসমূহসহ গোসলের সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে- প্রথমে গোসলের নিয়্যত করবে।

গোসলের নিয়্যত نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْجَنَابَةِ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতুল গোস্‌লা লিরফ'ইল জানা-বাতি।

তারপর, প্রথমতঃ দু'হাতের কব্জি তিনবার করে ধৌত করবেন। তারপর প্রস্রাবের রাস্তা (লিঙ্গ) ভালভাবে পরিস্কার করবেন, সেখানে 'নাজাসাত' (অপবিত্র বস্তু) থাকুক বা না-ই থাকুক। অতঃপর যদি শরীরের অন্য কোন স্থানে অপবিত্র কিছু লেগে থাকে তা পরিস্কার করতে হবে। তারপর শরীরে ধীরে ধীরে পানি পৌঁছাতে হবে। প্রথমে ডান পার্শ্বে তিন বার পানি, তারপর বাম পার্শ্বে তিনবার পানি দেওয়ার পর সমস্ত শরীর হাত দ্বারা আস্তে আস্তে রগড়াতে বা মর্দন করতে হবে। অতঃপর মাথায় এবং সমস্ত শরীরে তিনবার পানি দিতে হবে। গোসলের সময় ক্বেবলামুখী হওয়া কিংবা কারো সাথে কোন প্রকার কথাবার্তা বলা এবং কোন দো'আও পড়া যাবে না বরং গোসল করা শেষ হলে এগুলো করবেন।

সাবধানতা!

মাথার চুল যদি ঘন না হয়, তাহলে চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত পানি পৌঁছানো ফরয। আর চুল যদি ঘন হয়, তাহলে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছানো দরকার। চুলের খোঁপা খুলতে হবে না। চুল যদি এমন ঘন হয় যে, খোঁপা খোলা ব্যতীত চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে না, তাহলে খোঁপা খুলতে হবে। নাকের ছিদ্রের বিধান হচ্ছে- যদি এগুলো বন্ধ না হয় তাহলে পানি পৌঁছানো প্রয়োজন। আর যদি ছিদ্র ছোট হয়, তাহলে নড়াচড়া করে পানি পৌঁছানো দরকার। কোন স্থানে যদি জখম হয় এবং ওই স্থানে ব্যান্ডেজ থাকে আর এটা খুললে যদি ব্যাথা কিংবা ক্ষতি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে অথবা কোন স্থানে কোন রোগ অথবা ব্যথার কারণে পানি প্রবাহিত করলে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তবে ওই সব স্থানে সম্পূর্ণরূপে মসেহ করতে হবে। আর যদি ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে, তা'হলে শুধু ব্যান্ডেজ মসেহ করবে, সম্পূর্ণ স্থান নয় এবং ব্যান্ডেজও প্রয়োজনীয় ক্ষতস্থান ছাড়া বেশি স্থানে রাখবে না। নতুবা মসেহ যথেষ্ট হবে না। যার ওযু নেই অথবা ধৌত করার প্রয়োজন আছে অথচ পানি ব্যবহারে অক্ষম অথবা এমন রোগ হয়েছে যে, যদি ওযু কিংবা গোসল করে তাহলে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকে অথবা আরোগ্য লাভ করা বিলম্বিত হবার সম্ভাবনা থাকে -এসব অবস্থায় পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায আদায় করতে হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই নামায ছেড়ে দেয়া যাবে না। তায়াম্মুমের বিবরণ পরবর্তীতে আসছে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য

যার উপর গোসল ফরয, তার জন্য মসজিদে যাওয়া, বায়তুল্লাহ্‌র তাওয়াফ করা, ক্বোরআন মজীদ স্পর্শ করা, অথবা স্পর্শ করা ছাড়া দেখে দেখে মুখে পড়া বা কোন আয়াত লিখা ও স্পর্শ করা অথবা এমন আংটি পরা, যার উপর ক্বোরআন মজীদের কোন অংশ আছে -এসবই না-জায়েয।

☐ ক্বোরআনের অনুবাদ ফার্সী অথবা উর্দূ অথবা যেকোন ভাষায় হোক না কেন

স্পর্শ করা এবং পড়া ক্বোরআনের হুকুমের অনুরূপ। ☐ দুরূদ শরীফ এবং অন্যান্য দো'আ ইত্যাদি পাঠ করলে যদিও কোন অসুবিধা নেই, তবুও ওযূ কিংবা কুল্লি করে পাঠ করা উচিত। ☐ উল্লিখিত ব্যক্তিদের আযানের উত্তর প্রদানে কোন অসুবিধা নেই। এটা বৈধ।

☐ যদি রাতে গোসল ফরয হয়, কিন্তু ফজরের নামাযের সময় গোসল করতে চায়, তাহলে রাতে প্রস্রাব সেরে ওযূ করে অথবা হাত-মুখ ধৌত করে ও কুল্লি করে পুনরায় ঘুমাবেন। এভাবে যদি খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলেও ওযূ করে, হাত ধৌত করে এবং কুল্লি করে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

ওযূর বর্ণনা

ওযূর ফরয ৪টি

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা ঃ এর পরিধি হচ্ছে দৈর্ঘ্যে কপালের চুলের গোড়া থেকে কণ্ঠনালী পর্যন্ত আর প্রস্থে উভয় কানের লতি পর্যন্ত। উল্লিখিত সম্পূর্ণ স্থানে পানি পৌঁছানো ফরয।

২. উভয় হাত ধৌত করা ঃ এর বিধান হচ্ছে, হাতের নখ থেকে শুরু করে কুনুই সমেত। যদি উক্ত স্থানের কোন অংশে এক লোম পরিমাণ জায়গাও শুষ্ক থাকে, তাহলে ওযূ হবে না। উল্লেখ্য যে, কুনুই হাতের অন্তর্ভুক্ত; তাই, তাও ধৌত করতে হবে। যদি নখে নখ-পলিশ থাকে, তাহলে নখে পানি না পৌঁছার কারণে ওযূ হবে না। তাই, নখ-পলিশ উত্তমরূপে দূরীভূত করে ওযূ করতে হবে। যদি গয়না, চুড়ি, আংটি এতই ছোট হয় যে, ওই স্থানে পানি না পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে ওই অলঙ্কার খুলে ওই স্থান ধৌত করা ফরয। আর যদি নাড়াচাড়া করলে ওই স্থানে পানি পৌঁছে যায়, তাহলে ভালভাবে নেড়েচেড়ে নেওয়া জরুরী। আর যদি বেশি ঢিলা হয়, নাড়াচাড়া ব্যতীত পানি যথাস্থানে পৌঁছে যায়, তবে নাড়াচাড়ার প্রয়োজন নেই।

৩. মাথা মসেহ করা ঃ মাথার এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরয। আর মসেহ করার সময় হাত ভেজা থাকা প্রয়োজন। যদি ইতোপূর্বে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ধৌত করার কারণে ভেজা থাকে, তবে যথেষ্ট হবে। অবশ্য নতুনভাবে ভিজিয়ে মসেহ করা ভাল। আর যদি মাথায় চুল না থাকে তাহলে মাথার (চামড়ার) এক চতুর্থাংশ, আর যদি মাথায় চুল থাকে, তবে বিশেষত মাথার চুলের এক চতুর্থাংশ মসেহ করা ফরয। উল্লেখ্য, পূর্ণ মাথা মসেহ্ করা মুস্তাহাব। পাগড়ী, টুপি ও দু'পাট্টার উপর মসেহ করা বৈধ নয়। অর্থাৎ এ মসেহ যথেষ্ট নয়।

৪. উভয় পা ধৌত করা ঃ পায়ের তালু থেকে গোড়ালী সমেত একবার ভাল করে ধৌত করা ফরয। আমাদের দেশে এমন কতেক লোক আছে, যাদের পায়ের আঙ্গুলে কোন রোগ হলে তা এমনভাবে বেঁধে রাখে যে, পায়ের নিচে পানি পৌঁছে না; ফলে ওযূও হয় না। আর ওযূর স্থানে এমন প্রসাধনী ব্যবহার করাও ঠিক নয়,

যার কারণে ওই স্থানে পানি পৌঁছতে পারে না। একই কারণে নখে পলিশ থাকা অবস্থায় ওযূ হবে না।

ওযূর সুন্নাত

১. নিয়্যত করা ঃ ওযূর নিয়্যত-

نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ رَفْعًا لِّلْحَدَثِ وَاسْتِبَاحَةً لِلصَّلٰوةِ وَتَقَرُّبًا اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আতাওয়াদ্ দ্বো-আ রাফ্'আল লিল হাদাসি ওয়াস্তিবা-হাতাল্ লিস্ সোয়ালা-তি ওয়া তাক্বাররুবান্ ইলাল্লা-হি তা'আ-লা-।

২. 'বিস্মিল্লাহ্' সহকারে আরম্ভ করা। ৩. মিস্ওয়াক করা। ৪. তিন বার কুল্লি করা। ৫. তিনবার নাকের ভিতর পানি পৌঁছানো। ডান হাতে পানি পৌঁছাবেন এবং বাম হাতে নাক পরিষ্কার করবেন। ৬. দাড়ি থাকলে তা খিলাল করা (ইহরামবিহীন অবস্থায়)। ৭. হাত ও পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা। ৮. তিন বার করে ধৌত করা। ৯. গোটা মাথা একবার মসেহ্ করা। ১০. কান দু'টিও মসেহ্ করা। ১১. তারতীব সহকারে অঙ্গগুলো ধোয়া বা মসেহ্ করা। ১২. অঙ্গগুলো এভাবে ধোয়া যেন পরবর্তী অঙ্গ ধোয়ার সময় পূর্ববর্তী অঙ্গ শুকিয়ে না যায়।

ওযূর মুস্তাহাব

১. ডান দিক থেকে আরম্ভ করা। ২. আঙ্গুলগুলোর পিঠ দ্বারা ঘাড় মসেহ্ করা। ৩. ক্বিবলামুখী হয়ে ওযূ করা। ৪. উঁচু জায়গায় বসে ওযূ করা। ৫. ওযূর পানি পবিত্র জায়গায় ফেলা। ৬. পানি ঢালার সময় সংশ্লিষ্ট অঙ্গে হাত বুলানো। ৭. নিজ হাতে পানি সংগ্রহ করা। ৮. পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য পানি সংগ্রহ করে রাখা। ৯. ওযূ করার সময় বিনা প্রয়োজনে অন্যের সাহায্য না নেওয়া। ১০.আংটি ঢিলা হওয়া অবস্থায় তা নেড়েচেড়ে নেওয়া। (অন্যথায় ফরয) ১১. ওযর না থাকলে ওয়াক্তের পূর্বে ওযূ করে নেওয়া। ১২. প্রশান্ত চিত্তে ওযূ করা (এমনি তাড়াহুড়া না করা যাতে কোন সুন্নাত কিংবা মুস্তাহাব ছুটে যায়)। ১৩. কাপড়-চোপড়কে ওযূর টপকে পড়া পানি থেকে বাঁচানো। ১৪. কান দু'টি মসেহ করার সময় ভেজা আঙ্গুল কানের ছিদ্র দু'টিতে প্রবেশ করানো। ১৫. যেসব অঙ্গে পানি উত্তমরূপে না পৌঁছার সম্ভাবনা থাকে, সেগুলোতে পানি পৌঁছানোর ব্যাপারে খেয়াল রাখা ইত্যাদি।

কি কি কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়

১. পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কোন বস্তু নির্গত হওয়া। ২. শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত অথবা পূঁজ বের হয়ে ওই স্থান থেকে গড়িয়ে পবিত্র স্থানে পৌঁছা। ৩. কোন কিছুর সাথে হেলান দিয়ে ঘুমানো (এভাবে যে, ওই বস্তুটি সরিয়ে নিলে সে পড়ে যাবে)। ৪. মুখ ভরে বমি করা। ৫. নামাযের অভ্যন্তরে বালেগ ব্যক্তি উচ্চস্বরে হাসা, যদিও ভুল বশতঃ হয়। ৬. বে-হুঁশ হয়ে যাওয়া, যদিও নেশাগ্রস্ত

অবস্থায় হয়। ৭. পুরুষ ও মহিলার লজ্জাস্থান মধ্যখানে কোন আড়াল ছাড়া একত্রিত হওয়া। এরূপ দু'মহিলার মধ্যখানে ঘটলেও ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

কি কি কারণে ওযূ মাকরূহ হয়

ওযূর মধ্যে মাকরূহ কাজ ১২টি- ১. মুখমণ্ডলে সজোরে পানি দেওয়া। ২. প্রয়োজনের চেয়ে কম বা বেশী পানি ব্যবহার করা। ৩. ওযূ করার সময় নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া দুনিয়াবী কথাবার্তা বলা। ৪. তিনবার নতুন পানি দ্বারা মাথা মসেহ্ করা। ৫. অপবিত্র স্থানে ওযূ করা। ৬. স্ত্রীলোকের ব্যবহারের অবশিষ্ট পানি দ্বারা ওযূ করা। ৭. মসজিদের ভিতর ওযূ করা। ৮. ওই পানিতে থুথু ফেলা বা নাক থেকে নাকটি বা শ্লেষ্মা ফেলা, যে পানি দিয়ে ওযূ করছে, যদিও চলমান পানি হয়। ৯. ওযূর মধ্যে পা ধোয়ার সময় পা ক্বেবলার দিক থেকে না ফেরানো। ১০. কুল্লি করার জন্য বাম হাত দ্বারা পানি নেওয়া, ওইভাবে নাকে পানি দেওয়ার ক্ষেত্রেও। ১১. বিনা ওযরে ডান হাত দ্বারা নাক পরিস্কার করা এবং ১২. নিজ ওযূর জন্য কোন পাত্র নির্দিষ্ট করে রাখা।

ওযূ করার পদ্ধতি

নিয়্যত করার পর নিম্নলিখিত দো'আ পড়তে পড়তে ওযূ আরম্ভ করবেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ـ اَلْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْكُفْرُ بَاطِلٌ ـ اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ وَالْكُفْرُ ظُلْمَةٌ ـ

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযী-ম ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি 'আলা-দী-নিল ইসলা-ম। আল্ ইসলা-মু হাক্কুন ওয়াল কুফ্রু বা-ত্বিলুন। আল্ ইসলা-মু নূ-রুন ওয়াল্ কুফ্রু যোল্মাতুন।

তারপর এমনভাবে ওযূ করবেন যাতে ওযূর ফরয, সুন্নাত ও মুস্তাহাবসমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়। তা এভাবে-

মহান আল্লাহ্ তা'আলার বিধান পালনের জন্য ওযূর প্রারম্ভে বিস্মিল্লাহ্ শরীফ পাঠ করে উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত তিনবার করে ধৌত করতে হবে। কমপক্ষে তিনবার ডানে-বামে, উপরে- নিচে, দাঁতে মিসওয়াক করবেন এবং প্রত্যেকবার মিসওয়াক ধৌত করতে হবে। অতঃপর হাতের তিন অঞ্জলি পানি দ্বারা মুখ ভর্তি তিনটি কুল্লি করবেন। রোযাদার না হলে গরগরা করবেন। অতঃপর তিনবার নাকের ভিতর পানি পৌঁছাবেন। রোযাদার না হলে নাকের ভিতরের নরম অংশ পর্যন্ত পানি পৌঁছাবেন। আর কব্জি দু'টি ডান হাত দ্বারা সম্পূর্ণ এবং বাম হাত দিয়ে নাক পরিষ্কার করবেন। তারপর দু'হাতে তিনবার মুখ ধৌত করবেন। মুখ ধৌত করার সময় আঙ্গুল দ্বারা দাড়ি খিলাল করবেন। তবে ইহরামকারী হাজী সাহেব দাড়ি খিলাল করবেন না। অতঃপর উভয় হাত কুনুইসহ তিনবার করে ধৌত করবেন।

অতঃপর সম্পূর্ণ মাথা, দু'কান এবং গর্দান মসেহ্ করবেন। তারপর উভয় পা গোড়ালীসহ বাম হাত দ্বারা ধৌত করবেন। হাত-পা ধৌত করার সময় আঙ্গুল থেকে শুরু করতে হয়। যেসব অঙ্গ অযূতে ধৌত করতে হয় সেগুলো তিন তিন বার করে ধৌত করতে হয় এবং ডান দিক থেকে আরম্ভ করতে হয়। অঙ্গসমূহ এমনভাবে ধৌত করতে হবে যাতে এক লোম পরিমাণ জায়গাও শুক্‌নো না থাকে। হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলোকে মধ্যম ধরনের খিলাল করতে হবে। তারপর ওযূ করে যে পানিটুকু পাত্রে অবশিষ্ট থাকবে তার কিছু পরিমাণ দাঁড়িয়ে পান করা মুস্তাহাব, এতে রোগমুক্তি লাভ হয়। তখন আকাশের দিকে মুখ করে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হয়-

سُبْحَانَکَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِکَ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ
اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ۔

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্‌দিকা আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লা-আন্‌তা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূ-বু ইলায়কা।

অতঃপর কলেমা শাহাদাত ও সূরা 'ইন্না আন্‌যাল্‌না' পড়বেন। অতঃপর দু'রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ আদায় করবেন। তাতে অনেক সাওয়াব রয়েছে। ওযূর সময় ক্বেবলার দিকে থুথু কিংবা কুল্লি করা এবং দুনিয়াবী কথা বলা মাকরূহ।

সাবধানতা ঃ প্রত্যেক অঙ্গ ধৌত করে হাত মালিশ করে নিতে হবে, যাতে পানি শরীর কিংবা কাপড়ে টপকে না পড়ে। বিশেষতঃ মসজিদে ওযূর পানির ফোঁটা পড়া মাকরূহ-ই তাহরীমী। নামায, তিলাওয়াত-ই সাজদা, জানাযার নামায এবং ক্বোরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য ওযূ থাকা ফরয। ওযূ ও গোসল করার সময় প্রয়োজন অনুসারে পানি ব্যবহার করতে হয়। বিনা কারণে অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা উচিত নয়। রক্ত, পূঁজ অথবা হলদে পানি ক্ষতস্থান থেকে বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে ওযূ ভেঙ্গে যাবে। আর যদি একই স্থানে থেকে যায়, গড়িয়ে না পড়ে তাহলে ওযূ ভাঙ্গবে না। ঘুমের কারণেও ওযূ ভঙ্গ হয়।

তায়াম্মুম

যার ওযূ নেই কিংবা গোসল করার প্রয়োজন হয়, অথচ পানি ব্যবহার করার ক্ষমতা নেই সে ওযূ ও গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করবে। পানি ব্যবহার করার ক্ষমতা না থাকায় কতিপয় অবস্থা রয়েছে। যেমন- এমন রোগে আক্রান্ত যে, ওযূ কিংবা গোসল করলে রোগ বেড়ে যাবার কিংবা দীর্ঘায়িত হবার আশঙ্কা থাকে, এক বর্গমাইলের অভ্যন্তরে পানির সন্ধান পাওয়া যায় না, এতো বেশী ঠান্ডা পড়ছে যে, গোসল করলে মরে যাবার কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে, শত্রুর ভয় থাকলে, যে মেরে ফেলবে কিংবা মাল ছিনিয়ে নেবে, কূপ আছে, অথচ

বালতি-রশি নেই, এ পরিমাণ পানি আছে যে, তা দিয়ে ওযূ বা গোসল করে ফেললে পিপাসার্ত হবার সম্ভাবনা থাকে ইত্যাদি।

তায়াম্মুম করার পদ্ধতি

তায়াম্মুমের নিয়্যতে 'বিস্‌মিল্লাহ্' পড়ে এমন কোন পাক জিনিসের উপর, যা মাটি জাতীয় হয়, উভয় হাত মেরে হাত দু'টি উল্টিয়ে নেবেন, ধূলিবালি বেশী লাগলে ঝেড়ে নেবেন, অতঃপর দু'হাতে সমগ্র মুখমণ্ডল মসেহ করে নেবেন, অতঃপর ২য় বার ওইভাবে হাত মারবেন এবং নখ থেকে কুনুইসহ উভয় হাত মাসেহ্ করে নেবেন। তায়াম্মুম হয়ে যাবে। তায়াম্মুমে মাথা ও পা মাসেহ্ করতে হয় না। তায়াম্মুমে শুধু ৩টি কাজ ফরয; বাকী সব সুন্নাত। ফরয ৩টি হচ্ছে: ১.নিয়্যত করা, ২.মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর হাত মেরে সমগ্র মুখে হাত বুলিয়ে নেওয়া এবং ৩. ২য় বার হাত মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তুর উপর মেরে উভয় হাতের কুনুই সমেত মাসেহ্ করা।

তায়াম্মুম কিভাবে ভঙ্গ হয়?

যে সব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয় কিংবা গোসল ওয়াজিব হয়, ওই সব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। এতদ্ব্যতীত পানি ব্যবহারে সক্ষম হলেও তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়।

নামায

নামাযের ৬টি পূর্বশর্ত

১. শরীর পাক হওয়া, ২. কাপড় পাক হওয়া, ৩. সতর ঢাকা, ৪. ক্বেবলামুখী হওয়া, ৫. সময় আসা ও ৬. নিয়্যত করা।

নামাযের মধ্যে ৭টি রুকন বা ফরয রয়েছে

১. প্রথমে 'আল্লাহু আকবার' বলে 'তাকবীরে তাহরীমাহ্' বাঁধা, ২.দাঁড়িয়ে নামায পড়া, ৩. ক্বিরআত পড়া, ৪. রুকু' করা, ৫.সাজদা করা, ৬.শেষ বৈঠকে বসা, ৭.সালাম ফিরানো (অর্থাৎ, এমন কোন কাজ করে নামায থেকে বের হয়ে আসা, যা করলে নামায ভঙ্গ হয়ে যায়। সালামও এমন একটি উত্তম কাজ)।

নামাযের মধ্যে ১৯টি ওয়াজিব, ২৬টি সুন্নাত, ১৫টি মুস্তাহাব রয়েছে। 'তাকবীরে তাহরীমাহ্' মূলত নামাযের শর্তাবলীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নামাযের ক্রিয়াদির সাথে গভীর সম্পর্কের কারণে রুকনের মধ্যও গণ্য করা হয়।

নামাযের মধ্যে ওয়াজিব কি কি

১. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্'আতকে ক্বির্‌আতের জন্য নির্দিষ্ট করা। ২. সূরা ফাতিহা পড়া। ৩. সূরা ফাতিহাকে সূরা মিলানোর পূর্বে পড়া। ৪. পূর্ণ সূরা ফাতিহা

একবার পড়া। ৫. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাক্'আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সকল রাক্'আতে সূরা মিলানো। ৬. দু'সাজ্দার মধ্যেকার তারতীব ঠিক রাখা। ৭. ক্বাওমাহ্ অর্থাৎ রুকু' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো। ৮. জালসাহ্ অর্থাৎ দু'সাজদার মধ্যখানে সোজা হয়ে বসা। ৯. তা'দীল অর্থাৎ রুকু', সাজদাহ্, ক্বাওমাহ্ ও জলসায় 'সুব্হা-নাল্লা-হ্' বলার মত সময়ের জন্য অঙ্গগুলো স্থির রাখা। ১০. ইমামের জন্য জরুরী (ফজর, মাগরিব, এশা, জুমু'আহ্, উভয় ঈদ, তারাভীহ্ ও রমযান শরীফের বিতরের) নামাযে উচ্চস্বরে ক্বির্আত পড়া, আর যোহর ও আসরের নামাযে নিম্নস্বরে ক্বির্আত পড়া। ১১. তিন অথবা চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠক করা, হোকনা তা নফল নামায। ১২. উভয় বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়া। ১৩. 'আস্-সালাম' শব্দের সাথে নামায থেকে বের হওয়া। ১৪. দো'আ ক্বুনূতের তাকবীর বলা। ১৫. দো'আ ক্বুনূত পাঠ করা। ১৬. উভয় ঈদের অতিরিক্ত তাকবীরসমূহ বলা। ১৭. ইমামের ক্বির্আতের সময় মুক্ব্তাদী চুপ থাকা। ১৮. ইমামের অনুসরণ করা এবং ১৯. সাজ্দাহ্-ই তিলাওয়াত করা।

উল্লেখ্য, এগুলো ব্যতীত নামাযে আরো কিছু কাজ আছে, সেগুলো হয়তো সুন্নাত, নতুবা মুস্তাহাব। ওইগুলো এখানে পৃথকভাবে বর্ণনা না করে এ সব বিষয়ের সমন্বয়ে সুন্নী হানাফী মাযহাব অনুযায়ী নামাযের পদ্ধতি নিম্নে আলোচনা করা গেল-

নামাযের পদ্ধতি

ক্বিয়াম: ওযূ সহকারে উভয় পা ক্বেবলার দিকে করে উভয় পায়ের মধ্যবর্তী স্থানে শুধুমাত্র চার আঙ্গুল পরিমাণ ফাঁক রেখে দণ্ডায়মান হবেন। আর নিয়্যত বাঁধার সময় উভয় হাতের তালু ক্বেবলামুখী করে এতটুকু উপরে তুলতে হবে যেন হাত কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং নিয়্যত করে 'আল্লাহু আকবার' বলে উভয় হাত নাভীর নিচে বাঁধতে হবে। বাম হাতের উপর ডান হাতকে এমনভাবে রাখতে হবে যাতে ডান হাতের মধ্যম তিন আঙ্গুল বাম হাতের পিঠের উপরে থাকে এবং ডান হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠা আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতকে জড়িয়ে ধরতে হবে। অতঃপর 'সানা' পড়তে হবে-

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ
وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآاِلٰهَ غَيْرُكَ

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবা-রকাস্মুকা ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা ওয়া লা-ইলা-হা গায়রুকা।

এরপর 'আঊযু বিল্লাহ্' ও 'বিস্মিল্লাহ্' পড়ে 'সূরা ফাতিহা' শরীফ পাঠান্তে নিচু স্বরে 'আ-মীন' বলতে হবে। তারপর একটি সূরা কিংবা ছোট তিন আয়াত কিংবা তিন আয়াতের সমপরিমাণ দীর্ঘ এক আয়াত পড়তে হবে। এরপর 'আল্লাহু

আকবার' বলে রুকূ'তে যেতে হবে। তাও এমনভাবে যে, হাঁটুর উপর হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করা থাকবে এবং পিঠ ও মাথার উপরিভাগ সমান হবে, উঁচু-নিচু হবে না। এ সময় কমপক্ষে তিনবার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم (সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযী-ম) বলতে হবে।

ক্বাওমা

রুকূ' থেকে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ (সামি 'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ্) বলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। যদি নামাযী একাকী হয়, তাহলে এরপর رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা- লাকাল হাম্দ্)ও বলতে হবে।

☐ যে ব্যক্তি পূর্ণ সময় ক্বিয়াম করতে (দাঁড়াতে) সক্ষম নয়, তবে কিছু সময় ক্বিয়াম করতে (দাঁড়াতে) সক্ষম, তার বেলায় বিধান হচ্ছে- এমন ব্যক্তি যতটুকু সময় দাঁড়াতে সক্ষম ততটুকু সময় দাঁড়াবে। এটা অপরিহার্য, যদিও 'তাহরীমাহ্' (প্রথম তাকবীর) ও এক আয়াত পরিমাণ হয়। উল্লেখ্য, এ সামান্য পরিমাণ দাঁড়ানোও যখন অপরিহার্য, তখন সামান্য অসুবিধার কারণে বসে নামায পড়া কীভাবে জায়েয হবে? এ মাসআলা ভালভাবে স্মরণ রাখা ও আমল করা জরুরি। কেননা, মানুষ এ ব্যাপারে বড়ই গাফিল। [আলমগীরী, রুকনে দ্বীন ইত্যাদি]

☐ যে ব্যক্তি ক্বিয়াম তথা দাঁড়াতে পারে, কিন্তু রুকূ'-সাজদা করতে সক্ষম নয়, তার সম্পর্কে বিধান হচ্ছে- সে বসে নামায আদায় করার চেয়ে দাঁড়িয়ে ইশারার সাহায্যে নামায আদায় করবে। এটাই উত্তম। [ফাতওয়া-ই শামী]

সাজ্দাহ্

এরপরে 'আল্লাহু আকবার' বলে সাজদায় যাবেন। এভাবে যে, প্রথমে হাঁটু মাটিতে রেখে তারপর উভয় হাত ক্বেবলামুখী করে মাটিতে রাখতে হবে। তার মধ্যখানে সাজদা করতে হবে, এভাবে যে, প্রথমে নাক, তারপর মাথা রাখবেন যাতে কপাল ও নাকের নরম হাড্ডি মাটির উপর সমানভাবে থাকে।

হাতের বাহুকে পাঁজরের সাথে, পেটকে উরুর সাথে মিলানো যাবে না এবং উরুকে গোড়ালী থেকে পৃথক রাখবেন ও উভয় পায়ের সব আঙ্গুলের পেটের উপর ভর করে সেগুলোর সম্মুখভাগ ক্বেবলামুখী করে রাখতে হবে। হাতের তালু মাটির সাথে মিলিয়ে রাখতে হবে। তখন কমপক্ষে ৩ বার سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى (সুবহা-না রব্বিয়াল্ আ'লা) বলবেন। তারপর মাথা উঠাবেন এভাবে যে, প্রথমে কপাল, তারপর নাক, তারপর মুখমণ্ডল, তারপর হাত উঠাবেন।

বৈঠক

দু'সাজদার মাঝখানে অবস্থান করাকে 'জালসাহ' বা বৈঠক বলে। সাজদা থেকে মাথা উঠিয়ে ডান পা সোজা রেখে আঙ্গুলগুলো ক্বেবলামুখী করে এবং বাম পা মাটিতে বিছিয়ে এর উপর উত্তমরূপে সোজা হয়ে বসতে হবে। হাত দু'টি দু'উরুর উপর ক্বেবলামুখী করে রাখতে হবে। এখন (দু'সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বসা অবস্থায় اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ وَاعْفِنِيْ (আল্লাহুম্মাগ্

ফির্‌লী- ওয়ার্‌হাম্‌নী- ওয়াহ্‌দিনী- ওয়ার্‌ যুক্বনী- ওয়া'ফিনী-) বলা ইমাম ও মুক্‌তাদী উভয়ের জন্য মুস্তাহাব। [ফতোয়ায়ে রেযভিয়াহ্‌, ৩য় খণ্ড]

বৈঠকে কমপক্ষে ১বার 'সুবহানাল্লাহ্‌' বলার সময় পরিমাণ সোজা হয়ে বসা 'ওয়াজিব'। (বাহারে শরীয়ত)

দ্বিতীয় সাজদা

'আল্লাহু আকবার' বলে দ্বিতীয় সাজদায় যেতে হবে এবং প্রথম বারের মতই সাজদা করতে হবে। তারপর মাথা উঠিয়ে হাঁটুতে হাত দিয়ে ও ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে।

দ্বিতীয় রাক্‌'আত

এখন শুধু 'বিসমিল্লাহ্‌' শরীফ পাঠ করে 'সূরা ফাতিহা' পড়ে অন্য একটি সূরা বা ছোট তিন আয়াত বা সমপরিমাণ দীর্ঘ এক আয়াত (ক্বিরআত) পড়ে রুকূ'তে, এরপর সাজদায় যেতে হবে।

ক্বা'দাহ্‌ বা বৈঠক

সাজদা থেকে উঠে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসতে হবে এবং 'তাশাহ্‌হুদ' (আত্তাহিয়্যা-তু) পাঠ করতে হবে এবং 'আত্তাহিয়্যা-তু' পড়ার সময় যখন শব্দ لَا(লা-) এর নিকটে যাবেন, তখন ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও মধ্যমা দ্বারা বৃত্ত বানাবেন, তারপর কনিষ্ঠা ও কনিষ্ঠার পার্শ্ববর্তী আঙ্গুলকে হাতের তালুর সাথে মিলাতে হবে। আর যখন لَا-তে পৌঁছবেন, তখন শাহাদাত আঙ্গুল উঠাতে হবে আর যখন اِلَّا শব্দে পৌঁছবেন, তখন শাহাদাত আঙ্গুল নামিয়ে নিতে হবে। হাতের তালুকে পূর্বের ন্যায় তাৎক্ষণিকভাবে সোজা করে নেবেন এবং আঙ্গুলগুলোকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দেবেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আত

যদি নামায দু'রাক্‌'আতের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে তাশাহ্‌হুদ পড়ে দণ্ডায়মান হতে হবে। যদি ফরয ছাড়া অন্য নামায হয় তাহলে প্রতি রাক্‌'আতে সূরা মিলাবেন আর যদি ফরয হয়, তাহলে শুধু 'সূরা ফাতিহা' পড়তে হবে। অন্য কোন সূরা মিলাতে হবে না। পূর্বে উল্লিখিত নিয়মে রুকূ'-সাজদা করে অবশিষ্ট রাক্‌'আত বা রাক্‌'আতগুলো সম্পন্ন করার পর শেষ বৈঠকে বসে যেতে হবে।

শেষ বৈঠক

এখন পূর্বের ন্যায় বসে প্রথমে তাশাহ্‌হুদ পড়ে নামাযের দরূদ তথা 'দরূদে ইব্রাহীমী শরীফ' পড়ে সবশেষে দোআ'-ই মা'সূরা পড়তে হবে।

তাশাহ্‌হুদের কতিপয় জরুরী বিষয়

☐ তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিয়্যা-ত) পড়ার সময় সেটার অর্থের দিকে ধ্যান দেওয়া জরুরী। অর্থাৎ তাশাহ্‌হুদ পড়ার সময় ইচ্ছা এ থাকবে যে, 'আমি আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রশংসা করছি এবং আল্লাহর মাহবূব-ই আ'যম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র দরবারে সালাম পেশ করছি। তদসঙ্গে নিজেদের উপর এবং

আল্লাহর নেক বান্দাদের উপর সালাম পাঠ করছি।' তবে তাশাহ্‌হুদ পড়ার সময় যেন মি'রাজের ঘটনার ধ্যানে মগ্ন না হয়ে যান। [দুররে মুখতার, ফতোয়ায়ে আলমগীরী]

☐ তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিয়্যাত) পড়ার সময় হুযূরে আক্বদাস সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী সূরতকে নিজের হৃদয়ে হাযির জানবেন। আর হুযূরে আক্বদাসের সূরত মোবারককে নিজের অন্তরে নিবদ্ধ করে 'আস্‌ সালামু আলাইকা আইয়্যুহান্‌ নাবিয়্যু' আরয করবেন। নিশ্চিত বিশ্বাস রাখবেন যেন আমার এ সালাম হুযূর আক্বদাস্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে পৌঁছছে। আর হুযূর আক্বদাস্‌ও আমার সালামের, হুযূরের মহামর্যাদার উপযোগী জবাবও দান করছেন। [ইমাম গাযযালী কৃত ইয়াহ্‌ইয়াউল উলূম (আরবী) ১ম খণ্ড, ১০৭পৃ.]

☐ দরূদ শরীফ (দরূদে ইব্রাহীমী শরীফ)তে হুযূর আক্বদাস্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ও হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহীম আলাইহিস্‌ সালাম'র পবিত্র নামের পূর্বে 'সায়্যিদিনা' সংযোজন করে বলা উত্তম।

তাশাহ্‌হুদ (আত্তাহিয়্যা-ত)-এর পর দরূদ-ই ইব্রাহীমী শরীফ এবং দো'আ-ই মা'সূরা পাঠ করে সালাম ফেরাবেন।

সালাম

ডান দিকে মুখ করে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰه (আস্‌ সালা-মু আলাইকুম ওয়া রহ্‌মাতুল্লাহ্‌) বলবেন। তারপর একই বাক্য বলে বাম দিকে সালাম ফেরাতে হবে। যদি ফরয নামায হয় তা হলে সালাম শেষে اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ...الخ (আল্লা-হুম্মা আন্‌তাস্‌ সালাম... শেষ পর্যন্ত) পড়বেন।

☐ উল্লেখ্য, জামা'আত সহকারে নামায আদায় করলে ইমাম সালাম ফিরানোর পর সবাই উচ্চস্বরে যিক্‌র করবেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন এত উচ্চস্বরে যিক্‌র করতেন যে, তাঁদের আওয়াজ শোনে পার্শ্ববর্তী এলাকায় মহিলা ও শিশুরা বুঝতে পারতেন মসজিদে জামা'আত সমাপ্ত হয়েছে। সুতরাং তখন নিম্নলিখিত যিক্‌র ও সালাম পাঠ করা যেতে পারে-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰه ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا نَبِىَّ اللّٰه ـ اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا حَبِيْبَ اللّٰه وَ عَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِىْ يَارَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ـ

উচ্চারণঃ লা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারী-কা লাহূ- লাহুল্‌ মুল্‌কু, ওয়া লাহুল হাম্‌দু, য়ুহ্‌য়ী- ওয়া য়ুমী-তু ওয়া হুয়া 'আলা- কুল্লি শায়্‌ইন্‌ ক্বদী-র। আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলায়কা এয়া সাইয়্যিদী এয়া রসূলাল্লাহ্‌।

আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলায়কা এয়া সায়্যিদী এয়া নাবীয়্যাল্লাহ্‌। আস্‌সালাতু ওয়াস্‌ সালামু আলায়কা এয়া সাইয়্যিদী এয়া হাবীবাল্লাহ্‌। ওয়া 'আলা- আ-লিকা ওয়া আসহা-বিকা এয়া সাইয়্যিদী এয়া রহমাতাল্‌ লিল্‌ 'আ-লামী-ন।

সাবধানতা ! একাগ্রতা ও নম্রতা সহকারেই নামায পরিপূর্ণরূপে আদায় করবেন। তাড়াহুড়ো করে ওযূ করা, ইমামের আগে নামাযে কিছু করা, স্বীয় নামাযে রুকূ', সাজদা একাগ্রতার সাথে না করা, রুকূ'র পর সম্পূর্ণরূপে সোজা হয়ে দণ্ডায়মান না হওয়া, দু'সাজদার মাঝখানে সম্পূর্ণরূপে না বসা, অন্যান্য মাসআলা-মাসাইলের ব্যাপারে সতর্ক না থাকা অনেক ক্ষতির কারণ হয়। ইমামের পেছনে মুক্‌তাদীর জন্য ক্বির্‌আত ও সূরা ফাতিহা ইত্যাদি পড়া নিষেধ।

ফরয নামায, বিতর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা এবং ফজরের সুন্নাত দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। কোন কারণ ব্যতীত, সুস্থ-সবল ব্যক্তি বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। প্রয়োজনে লাঠি কিংবা দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে হবে। যদি দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র 'আল্লাহু আকবার' বলার সামর্থ্য থাকে তাহলে এতটুকু বলবে অতঃপর বসে বসে অবশিষ্ট নামায আদায় করবে। কোন কোন মহিলা ও পুরুষ এ ক্ষেত্রে নানা বাহানা করে; কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, দাঁড়িয়ে নফল নামায আদায় করা ও বসে আদায় করার চেয়ে দ্বিগুণ সাওয়াব।

মহিলার নামায

নামায পড়ার সময় মহিলাগণ প্রথমে নিয়্যত করে হাতদু'টি কাপড়ের ভিতর নিজের কাঁধ পর্যন্ত উত্তোলন করবেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত নিচে নামিয়ে বুকের উপর হাত দু'টি বাঁধবেন। রুকূ'তে এতটুকু ঝুঁকবেন যে, হাত হাঁটুতে পৌঁছে যাবে অতঃপর হাতের আঙ্গুল হাঁটুর উপর মিলিতভাবে রাখবেন। সাজদা সঙ্কুচিত হয়ে করতে হবে। এভাবে যে, বাহু পাঁজরের সাথে, পেট উরুর (রান) সাথে, উরু পায়ের গোড়ালীর সাথে এবং গোড়ালী মাটির সাথে মিলিত থাকবে। সাজদার পর উভয় পা ডান দিকে বের করে বাম রানের উপর বসতে হবে। অবশিষ্ট নামায একইভাবে আদায় করতে হবে। কামিজের আস্তীন সম্পূর্ণ, ওড়না ও পোশাক এতটুকু ঢিলাঢালা হওয়া প্রয়োজন, যাতে শরীরের রঙ এবং চুলের চমক দৃষ্টিগোচর না হয়। আর সালোয়ার পায়ের গোড়ালীর নিচে পর্যন্ত লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: পবিত্রতা ও নামায সংক্রান্ত এ গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত মাসআলা-মাসাইল আ'লা হযরত রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সুযোগ্য খলীফা সদরুস শারী'আহ্‌ মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আ'যমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ- 'বাহারে শরীয়ত, ২য় ও ৩য় খণ্ড', তাছাড়া

'ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ', 'দুররে মুখতার' ও 'ফাতওয়া-ই শামী' ইত্যাদি হতে উদ্ধৃত। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের জন্য নামায অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন ইসলামী ফরয। এটা মুসলমানদের জীবনে অবশ্য পালনীয়। নিজেও এবং নিজেদের সন্তানদের দ্বীনদার এবং পাঁচ ওয়াক্‌ত নামাযী হিসেবে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। হাদীস শরীফ ও ফিক্বহের বিধানানুসারে সন্তানের বয়স যখন ৭ বছর হবে তখন নামায পড়ার জন্য নির্দেশ দিতে হবে। যখন দশ বছর হয় এবং ছেলে বা মেয়ে নামায না পড়ে, স্ত্রীও যদি বে-নামাযী হয়, তখন তাদের মারধর করে নামায পড়ানোর নির্দেশ রয়েছে। নামায সংক্রান্ত মাসআলা-মাসাইল ভালভাবে নিজে জেনে নেওয়া এবং অপরাপর সবাইকেও জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

কি কি কারণে নামায ভঙ্গ হয়

১.কথা বলা। (চাই তা ইচ্ছে করে হোক কিংবা ভুলে, কম হোক বা বেশি।) ২.সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাম করা। চাই তা ইচ্ছে করে হোক বা ভুলে। ৩.সালামের জবাব দেওয়া- ইচ্ছাকৃত হোক কিংবা ভুলবশতঃ। ৪.হাঁচির জবাব দেওয়া। ৫. দুঃসংবাদের জবাবে **اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ** পড়া। ৬. সুখবর শুনে **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** বলা। ৭. আশ্চর্যজনক খবর শুনে **سُبْحَانَ اللّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** বলা। ৮. নামাযে নিজ ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লুক্‌মাহ্‌ দেওয়া। ৯. নামাযের মধ্যে এমন কিছু চাওয়া, যা মানুষের কাছে চাওয়া হয়। যেমন- "হে খোদা, আমার সাথে অমুক মহিলার বিবাহ দাও অথবা আমাকে এক হাজার টাকা দাও।" ১০. আহ্‌! উহ্‌! কিংবা উফ্‌ বলা। ১১. ক্বোর্‌আন শরীফ থেকে দেখে দেখে তিলাওয়াত করে নামায পড়া। ১২. ক্বোর্‌আন শরীফ ভুল পড়া। ১৩. আমলে কাসীর (যে কাজে উভয় হাত ব্যবহৃত হয়), যা দেখে দূরবর্তী লোকের এমন ধারণা হয় যে, ওই কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তিটি নামাযে রত নয়। (যেমন, কাপড় পরিধান করা, স্বেচ্ছায় অথবা কারো ধাক্কায় নামাযী নিজ স্থান থেকে কয়েক কদম সরে যাওয়া ইত্যাদি কারণে নামায ভেঙ্গে যাবে।) ১৪. জেনে-শুনে কিংবা ভুলে কোন কিছু খাওয়া বা পান করা। ১৫. বিনা ওজরে ক্বিবলাহ্‌র দিক থেকে বুক ফেরানো। ১৬. বিনা প্রয়োজনে দু'সারি পরিমাণ স্থান একবারে চলা। ১৭. ইমামের আগে চলে যাওয়া। ১৮. নামাযে তিনটি শব্দ পরিমাণ লেখা। ১৯. ব্যথা কিংবা বিপদের কারণে কাঁদা বা শব্দ করা। ২০. উচ্চস্বরে হাসা। ২১. নামাযে নয় এমন ব্যক্তির কথা নামাযরত ব্যক্তি মান্য করা। ২২. কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে জামা'আতে কোন মহিলা, কোন পুরুষের বরাবর হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া। ২৩. ইমামতের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ইমামের স্থলবর্তী করা। ২৪. কাউকে খলীফা না বানিয়ে ইমাম মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসা। ২৫. বায়ু ত্যাগ করার পর (ওযূ' চলে যাওয়ার পর) ওই স্থানে ৩বার 'সুবহা-নাল্লা-হ্‌' পড়ার সময় পরিমাণ অবস্থান করা।

কি কি কারণে নামায মাকরূহে তাহ্‌রীমী হয়

১. চাদর ও ওড়না নিয়ম অনুযায়ী না পরে উভয় কাঁধের উপর দিয়ে মাথার উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া। ২.বিনা অসুবিধায় ছোট ছোট পাথর সাজদার স্থান থেকে সরানো। আর যদি সাজদা করতে অসুবিধা হয়, তবে একবার সরানো জায়েয আছে। ৩.মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড় উপরে উঠানো। ৪.জামার হাত কিংবা কিনারা উঠানো অবস্থায় নামায পড়া। ৫.নামাযী নিজ শরীর, কাপড় কিংবা দাড়ি নিয়ে খেলা করা। ৬.এমন কোন বস্তু মুখে রাখা, যা দ্বারা ওয়াজিব পরিমাণ ক্বিরআত আদায়ে অসুবিধা হয়। ৭.নামাযরত অবস্থায় আঙ্গুল চটখানো। ৮.এক হাতের আঙ্গুলসমূহ অন্য হাতের আঙ্গুলের ভিতরে ঢুকানো। ৯.নামাযরত অবস্থায় উভয় হাত কোলের উপর রাখা। ১০.নামাযে রত অবস্থায় মুখ ফিরিয়ে এদিক-ওদিক দেখা। ১১. নামাযে কুকুরের মত বসা। অর্থাৎ নিতম্বের উপর বসে উভয় হাঁটু খাড়া করে বুকের সাথে লাগিয়ে উভয় হাত দিয়ে মাটির উপর ভর করে বসা। অথবা উভয় পা খাড়া করে গোড়ালির উপর বসা এবং উভয় হাত মাটির উপর রাখা। ১২. নামাযী ব্যক্তি অন্য কারো মুখের দিকে মুখ করে বসা মাকরূহে তাহ্‌রীমী। ১৩. নিজ থেকে (স্বেচ্ছায়) হাই তোলা। ১৪. পুরুষ চুলচুটি বেঁধে নামায পড়া। ১৫. কোন অসুবিধা ছাড়া ইমাম একহাত উঁচু স্থানে আর মুক্বতাদী নিচে দাঁড়ানো। ১৬. নামাযী ব্যক্তি প্রাণীর ছবি সম্বলিত কাপড় পরে নামায পড়া। তেমনিভাবে নামাযী ব্যক্তির উপরে কিংবা ডানে-বামে প্রাণীর ছবি থাকাও মাকরূহে তাহ্‌রীমী। ১৭. রুকু', সাজদা, ক্বাওমাহ্‌ (রুকু' থেকে সোজা দাঁড়ানো) ও উভয় সাজদার মধ্যখানের বৈঠক ধির-স্থির ও স্বস্তি সহকারে না করা। ১৮.পায়খানা ও পেশাবের বেগ নিয়ে নামায পড়া। ১৯. চাদর শরীরে এভাবে পেঁচানো যে, কোন দিক দিয়ে হাত বের করা যায় না। ২০. মাথার মধ্যভাগ খোলা রেখে পাগড়ী বেঁধে নামায পড়া। ২১. নাক, মুখ ঢেকে যায় এমন কাপড়ের টুকরা দ্বারা নাক, মুখ বেঁধে নামায পড়া। ২২. জামা থাকা সত্ত্বেও খোলা দেহে অথবা গেঞ্জি জাতীয় কাপড় পরে নামায পড়া। ২৩. ইমামের পেছনে মুক্বতাদীর ক্বির্‌আত পড়া। ২৪. পায়ের গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলানো ইত্যাদি।

কি কি কারণে নামায মাকরূহে তানযীহী হয়

১. ভাল কাপড় থাকা সত্ত্বেও ময়লা কাপড় পরে নামায পড়া। ২. কোন অসুবিধা ছাড়া একাকী মেহরাবের ভিতরে দাঁড়ানো। ৩. চাদর ইত্যাদি ডান বগলের নিচ দিয়ে এনে বাম কাঁধের উপর দিয়ে উভয় প্রান্ত ছেড়ে দেওয়া। ৪. অপারগতা ছাড়া চার জানু হয়ে বসা। ৫. হাই আসার সময় মুখ খোলা রাখা। ৬. চক্ষু বন্ধ করা। ৭. 'সুবহানাল্লাহ্‌' ইত্যাদি আঙ্গুল কিংবা তাসবীহের সাহায্যে গণনা করা। তবে যদি আঙ্গুলের মাথা দাবিয়ে দাবিয়ে গণনা করে, তবে

মাকরূহ হবে না। ৮. ওযর ছাড়া 'আমলে ক্বলীল' (পূর্বোল্লিখিত আমলে কাসীরের কম পর্যায়ের কাজ) করা। ৯. থুথু ফেলা, আস্তীনের সাহায্যে বাতাস করা ও ফুঁক দিয়ে -এ ধরনের 'আমলে ক্বলীল' করা। ১০. ওযর ছাড়া খালি মাথায় নামায পড়া। তবে টুপি বা পাগড়ী মাথা থেকে পড়ে গেলে আমলে ক্বলীলের মাধ্যমে তা উঠিয়ে নিতে অসুবিধে নেই। ১১. সাজদায় পা ঢেকে ফেলা। ১২.ডানে-বামে হেলে যাওয়া বা ঝুঁকে যাওয়া। ১৩. ওযর ছাড়া এক পায়ের উপর জোর দেওয়া। ১৪. নামাযে সুগন্ধী শুঁকা। ১৫. সাজদা ইত্যাদিতে হাত-পায়ের আঙ্গুলসমূহ ক্বিবলার দিক হতে ফিরিয়ে রাখা। ১৬. মসজিদে নিজ নামাযের জন্য কোন স্থান নির্দিষ্ট করা। ১৭. শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জোড়াগুলো নাড়া-চাড়া করে চটখানো। ১৮. ওযর ছাড়া রুকূ'তে হাঁটুর উপর এবং সাজদায় মাটির উপর হাত রাখা। ১৯. তাকবীরে তাহ্‌রীমার সময় উভয় হাত কানের উপরে উঠানো কিংবা কাঁধের নিচে রাখা। ২০. সাজদায় হাঁটুর সাথে পেট মিলানো। ২১. ইমামের অনুপস্থিতিতে ইক্বামতের সময় সবাই দাঁড়িয়ে সারি-কাতার সোজা করা। ২২. ইমাম তাড়াহুড়ো করে নামাযের এক রুকন থেকে অন্য রুকনে চলে যাওয়া, যে কারণে মুক্বতাদীগণ সুন্নাতসম্মত যিক্‌রগুলো আদায় করতে পারে না। ২৩. বিনা প্রয়োজনে মশা-মাছি তাড়ানো। উল্লেখ্য, রুকু'-সাজদা করার সময় পাজামা-পাঞ্জাবি কিংবা লুঙ্গি ইত্যাদি উঠালে তা মাকরূহে তাহরীমী হবে।

নামাযের জন্য কতিপয় সূরা

সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○
اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ
الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

উচ্চারণ ঃ আল্‌হাম্‌দু লিল্লা-হি রব্বিল ’আ-লামী-না; র্‌রাহ্‌মা-নির্‌ রাহী-মি; মা-লিকি ইয়াওমিদ্দী-ন। ইয়্যা-কা না’বুদু ওয়া ইয়্যা-কা নাস্‌তা’ঈ-ন। ইহ্‌দিনাস্‌ সেরা-ত্বোয়াল মুস্তাক্বী-মা; সেরা-ত্বোয়াল লাযী-না আন্‌’আমতা ’আলায়হিম্‌, গায়রিল মাগদ্বূ-বি ’আলায়হিম্‌, ওয়ালাদ্ব্‌ দ্বোয়া----ল্‌লী-ন।

সূরা ফীল

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفِيْلِ ○ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ
تَضْلِيْلٍ ○ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ○ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ○
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ○

উচ্চারণ ঃ আলাম্‌ তারা কায়্‌ফা ফা‘আলা রব্বুকা বিআস্‌হা-বিল্‌ ফী-ল। আলাম্‌ ইয়াজ্‌‘আল্‌ কায়দাহুম ফী- তাদ্বলী-লিওঁ; ওয়া আর্‌সালা ‘আলায়্‌হিম্‌ ত্বোয়ায়রান্‌ আবা-বীলা; তারমী-হিম্‌ বিহিজা-রতিম্‌ মিন্‌ সিজ্জী-লিন; ফাজা‘আলাহুম্‌ কা‘আস্‌ফিম্‌ মা’কূ-ল।

সূরা ক্বোরায়্‌শ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ○ اِيْلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ○ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا
الْبَيْتِ ○ الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ○ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ○

উচ্চারণ ঃ লিঈ-লা-ফি ক্বুরায়শিন; ঈ-লা-ফিহিম্‌ রিহ্‌লাতাশ্‌ শিতা----ই ওয়াস্‌ সোয়াইফ্‌। ফাল্‌ ইয়া’বুদূ- রাব্বা হা-যাল বায়তি; ল্‌লাযী---আত্ব্‌’আমাহুম্‌ মিন্‌ জূ-‘ইওঁ; ওয়া আ-মানাহুম্‌ মিন্‌ খাওফ্‌।

সূরা মা-’ঊন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

أَرَءَيْتَ الَّذِيْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ○ فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ○ وَلَا
يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ○ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ
صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ○ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ○

উচ্চারণ ঃ আরাআয়্‌তাল্‌ লাযী- ইয়ুকায্‌যিবু বিদ্দী-ন; ফাযা-লিকাল্লাযী- ইয়াদু’‘উল্‌ ইয়াতী-মা; ওয়ালা- ইয়াহুদ্দ্বো ’আলা- তোয়া’আ-মিল্‌ মিসকী-ন্‌। ফাওয়াইলুল্লিল্‌ মুসোয়াল্লী-নাল্‌; লাযী-নাহুম্‌ ’আন্‌ সোয়ালা-তিহিম সা-হূ-নাল্‌; লাযী-নাহুম ইয়ুরা----ঊ-না; ওয়া ইয়াম্‌না’ঊ-নাল্‌ মা’ঊ-ন।

সূরা কাউসার্‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ○ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ○
اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ○

উচ্চারণ ঃ ইন্না---আ’ত্বোয়ায়না-কাল কাউসারা; ফাসোয়াল্লি লিরব্বিকা ওয়ান্‌হার্‌। ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল্‌ আব্‌তার।

সূরা কা-ফিরূ-ন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○
وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ
دِيْنِ ○

উচ্চারণ ঃ ক্বুল ইয়া---আইয়্যুহাল কা-ফিরূ-ন। লা---আ’বুদু মা- তা’বুদূ-ন। ওয়ালা---আন্‌তুম ’আ-বিদূ-না মা---আ’বুদ। ওয়ালা---আনা ’আ-বিদুম্মা-‘আবাত্তুম। ওয়ালা---আন্‌তুম আ’-বিদূ-না মা-আ’বুদ। লাকুম দী-নুকুম্‌ ওয়ালিয়া দ্বী-ন।

সূরা নাস্‌র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَءَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

উচ্চারণ ঃ ইযা- জা----আ নাস্‌রুল্লা-হি ওয়াল্‌ ফাতহু; ওয়ারাআয়্‌তান্‌না-সা ইয়াদ্‌খুলূ-না ফী-দ্বী-নিল্লা-হি আফ্‌ওয়া-জান; ফাসাব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি রব্বিকা ওয়াস্তাগ্‌ফির্‌হু, ইন্নাহূ- কা-না তাউওয়া-বা-।

সূরা লাহাব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ؕ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ؕ

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۚ وَّامْرَاَتُهٗ ؕ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۚ

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

উচ্চারণ ঃ তাব্বাত ইয়াদা---আবী-লাহাবিওঁ ওয়াতাব্ব। মা---আগনা-'আন্‌হু মা-লুহূ- ওয়ামা- কাসাব। সায়াস্‌লা-না-রান যা-তা লাহাবিওঁ; ওয়ামরাআতুহ্‌, হাম্মা- লাতাল হাত্বোয়াব। ফী- জী-দিহা- হাবলুম্‌ মিম্‌ মাসাদ্‌।

সূরা ইখলাস্‌

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল হুওয়াল্লা-হু আহাদ। আল্লা-হুস্‌ সোয়ামাদ। লাম ইয়ালিদ; ওয়ালাম্‌ ইয়ূ-লাদ; ওয়ালাম্‌ ইয়াকুল্লাহূ- কুফুওয়ান্‌ আহাদ।

সূরা ফালাক্ব

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল আ'ঊ-যু বিরব্বিল ফালাক্বি; মিন শার্‌রিমা- খলাক্বা; ওয়া মিন্‌ শার্‌রি গা-সিক্বিন্‌ ইযা-ওয়াক্বাবা; ওয়া মিন্‌ শার্‌রিন্‌ নাফ্‌ফা-সা-তি ফিল 'উক্বাদি;

ওয়ামিন্‌ শার্‌রি হা-সিদিন্‌ ইযা-হাসাদ্‌।

সূরা নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

উচ্চারণ ঃ কুল আ'ঊ-যু বিরব্বিন্‌ না-সি; মালিকিন্‌ না-সি; ইলা-হিন্‌ না-সি; মিন্‌ শার্‌রিল ওয়াস্‌ওয়া-সিল খন্‌না-সি, ল্লাযী- ইয়ুওয়াস্‌ভিসু ফী- সুদূ-রিন্‌ না-সি; মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্‌ না-স্‌।

প্রত্যেক ফরয নামাযের সালাম ফিরিয়ে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করবেন। হাদীস শরীফে এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু লা---ইলা-হা ইল্লা- হূ, আল্‌ হাইয়্যুল ক্বাইয়ূ-ম্‌। লা-তা'খুযুহূ- সিনাতুঁ ওয়ালা- নাওম; লাহূ- মা-ফিস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়ামা- ফিল্‌ আরদ্ব, মান্‌যাল্লাযী- ইয়াশ্‌ফা'উ ইন্‌দাহূ---ইল্লা- বিইযনিহ্‌, ইয়া'লামু মা- বায়না আয়দী-হিম্‌ ওয়ামা- খাল্‌ফাহুম, ওয়ালা- ইয়ুহী-তূ-না বিশায়্‌ইম্‌ মিন্‌ 'ইল্‌মিহী---ইল্লা-বিমা-শা----আ, ওয়াসি'আ কুর্‌সিয়্যু-হুস্‌ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্‌ আরদ্ব, ওয়ালা- ইয়াঊ-দুহূ- হিফ্‌যুহুমা-, ওয়াহুয়াল্‌ আলিয়্যুল 'আযী-ম। *

সকাল-সন্ধ্যায় পড়বেন

আসরের নামাযের পর সূর্যাস্তের সময় 'সাইয়্যিদুল ইস্‌তিগফার' পড়লে সারা দিনের গুনাহ্‌ ক্ষমা হয়ে যায়, যেভাবে ফজরের সময় পড়লে সারা রাতের গুনাহ্‌ মাফ হয়ে যায়।

সায়্যিদুল ইস্তিগফার

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ

بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَاَبُوْءُ بِذَنْبِيْ فَاغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আন্তা রাব্বী লা-ইলা-হা ইল্লা- আন্তা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা- 'আহ্দিকা, ওয়া ওয়া'দিকা মাস্তাত্বোয়া'তু আ'ঊযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা- সোয়ানা'তু, আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা আলাইয়্যা, ওয়া আবূ-উ বিযাম্বী-, ফাগ্‌ফির্‌লী যুনূবী, ফাইন্নাহূ লা ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা-আন্তা।

এ দু'টি সময়ে 'আ'ঊ-যু বিল্লা-হিস্ সামী-'ইল 'আলী-ম্, মিনাশ্ শায়ত্ব-নির্ রাজী-ম্' ৩বার পড়ার পর **সূরা হাশরের শেষ তিনটি আয়াত** পড়লেও খুব উপকার পাওয়া যায়। ওই আয়াতসমূহ হচ্ছে:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○هُوَاللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞

উচ্চারণ ঃ হুয়াল্লা-হু ল্লাযী- লা---ইলা-হা ইল্লা-হূ-; 'আ-লিমুল্ গায়্‌বি ওয়াশ্ শাহা-দাতি, হুয়ার্ রাহমানুর্ রাহীম। হুয়াল্লা-হুল্ লাযী লা---ইলা-হা ইল্লা-হূ-, আল্‌মালিকুল কুদ্দূ-সুস্ সালা-মুল্ মু'মিনুল্ মুহায়মিনুল্ আযী-যুল্ জাব্বা-রুল্ মুতাকাব্বির; সুব্হা-নাল্লা-হি 'আম্মা-ইয়ুশ্‌রিকূ-ন। হুয়াল্লা-হুল খা-লিকুল বা-রিউল মুসোয়াওভিরু লাহুল আসমা----উল্ হুসনা-; ইয়ুসাব্বিহু লাহূ- মা- ফিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্ব, ওয়া হুয়াল্ আযী-যুল্ হাকী-ম্।

---

* উল্লেখ্য, সূরাসমূহ ও আয়াতের বিশুদ্ধ অনুবাদ ও তাফসীর 'কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান' (বাংলা সংস্করণ) এবং 'কানযুল ঈমান ও নূরুল ইরফান' (উচ্চারণসহ বাংলা সংস্করণ)-এ দেখুন।

রাতে শয়নের পূর্বে পড়বেন

উল্লেখ্য, শয়নের পূর্বে সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্' তিলাওয়াত করলে আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে। সে কখনো উপোস করবে না। আর আয়াতুল কুর্‌সী পড়লে সারা রাত আল্লাহ্ পাকের হিফাযতে থাকা যায়। রাতে চুরি-ডাকাতি ইত্যাদি থেকেও নিরাপদে থাকা যায়। নিম্নলিখিত দো'আগুলো পড়লেও কর্জ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ইন্‌শা-আল্লাহ্ আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ ـ اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ـ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَىْءٍ ـ مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ـ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ـ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَىْءٍ ـ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَا صِيَتِنَا ـ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُوْنَكَ شَىْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَىْءٌ ـ اِقْضِ عَنِّى الدَّيْنَ وَاَغْنِنِىْ مِنَ الْفَقْرِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ ـ اَللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ○ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ۫ وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ۫ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ـ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ ـ تُعْطِىْ مَنْ تَشَآءُ مِنْهُمَا وَتَمْنَعُ مَنْ تَشَآءُ ـ اِرْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِنِىْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ـ اَللّٰهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَكَاشِفَ الْغَمِّ وَمُجِيْبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّيْنَ رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَرَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ ـ اِرْحَمْنِىْ رَحْمَةً تُغْنِنِىْ بِهَا عَنْ رَّحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ ـ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كِبَرِسِنِّىْ وَانْقِطَاعِ عُمُرِىْ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাক্‌ফিনী বিহালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা ওয়া আগ্‌নিনী বিফাদ্বলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা। আল্লা-হুম্মা রাব্বাস্‌সামা-ওয়া-তিস্ সাব'ই ওয়া রাব্বাল 'আর্‌শিল 'আযীম। রাব্বানা- ওয়া রব্বা কুল্লি শাই। মুন্‌যিলাত্ তাওরা-তি ওয়াল্ ইন্‌জী-লি ওয়াল্ ক্বোরআন। ফা-লিক্বাল হাব্বি ওয়ান্ নাওয়া-। আ'ঊ-যুবিকা মিন্ শার্‌রি কুল্লি শাই। আন্তা আ-খিযুম্ বিনা-সিয়াতিনা-। আন্তাল আউয়ালু ফালায়সা ক্বাবলাকা শায়উন। ওয়া আন্তাল আ-খিরু ফালায়সা বা'দাকা শায়উন। ওয়া আন্তাল বা-ত্বিনু ফালায়সা দূ-নাকা শায়উন। ওয়া আন্তায্ যোয়া-হিরু ফালায়সা ফাওক্বাকা শায়উন। ইক্বদ্বি 'আন্নিদ্ দায়না ওয়া আগ্‌নিনী মিনাল্ ফাক্বরি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊ-যু বিকা মিনাল জুবনি ওয়াল বুখ্‌লি। ওয়া

আ'ঊ-যু বিকা মিন গালাবাতিদ্ দায়্নি ওয়া ক্বাহ্রির্ রিজা-ল। আল্লা-হুম্মা মা-লিকাল মুল্কি তু'তিল মুলকা মান্ তাশা----উ ওয়া তান্যি'উল মুলকা মিম্মান্ তাশা----উ ওয়া তু'ইযু মান্ তাশা----উ ওয়া তুযিল্লু মান্ তাশা----উ বিয়াদিকাল্ খায়র্; ইন্নাকা 'আলা- কুল্লি শায়্ইন্ ক্বাদীর। তূ-লিজুল্ লায়লা ফিন্নাহা-রি ওয়া তূ-লিজুন্ নাহা-রা ফিল্ লায়ল। ওয়া তুখরিজুল হাইয়্যা মিনাল মাইয়্যিতি ওয়া তুখরিজুল মাইয়্যিতা মিনাল হাইয়্যি; ওয়া তারযুক্কু মান্ তাশা----উ বিগায়রি হিসা-ব। রাহমা-নাদ্ দুন্য়া ওয়া রাহী-মাল্ আ-খিরাতি। তু'ত্বী মান্ তাশা----উ মিনহুমা- ওয়া তামনা'উ মান তাশা----উ। ইর্হাম্নী- রাহ্মাতান তুগ্নিনী বিহা- 'আর্ রাহ্মাতি মান্ সিওয়া-কা। আল্লা-হুম্মা ইয়া-ফা-রিজাল্ হাম্মি ওয়া কা-শিফাল্ গাম্মি ওয়া মুজী-বা দা'ওয়াতিল্ মুদ্বত্বোয়াররী-না রাহমা-না-দ্ দুন্য়া ওয়া রাহী-মাল্ আ-খিরাহ্; ইরহাম্নী- রাহমাতান্ তুগ্নিনী- বিহা- 'আর্ রাহ্মাতি মান্ সিওয়া-কা। আল্লা-হুম্মাজ্'আল্ আওসা'আ রিয্ক্বিকা আলাইয়্যা 'ইনদা কিবারি সিন্নী- ওয়া ইন্ক্বিত্বোয়া-'ই 'ওম্রী-।

রাতে ঘুমানোর সুন্নাতসম্মত নিয়ম

ঘুমানোর সুন্নাতসম্মত নিয়ম হচ্ছে, পাক পবিত্র বিছানায় ওযূ অবস্থায় প্রথমে পা দু'টি টেনে দিয়ে বসবেন তারপর সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস ৩ বার করে পড়ে দু'হাতের তালুতে ফুঁক দিয়ে শরীরের যতটুকু অংশে হাত যায় ততটুকুর উপর মসেহ্ করে নেবেন। এতে নিদ্রাকালে শয়তান-জিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তারপর ডান করটে শুয়ে যাবেন।

উল্লেখ্য, ইসলামের পাঁচ বুনিয়াদের মধ্যে ঈমানের পর নামাযের স্থান। পাঁচ ওয়াক্বতের নামায প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন বালেগ মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। এশার নামাযের পর বিতরের নামায এবং দু' ঈদের নামায ওয়াজিব। পাঁচ ওয়াক্বতের ফরয নামাযগুলো মসজিদে জামা'আত সহকারে সম্পন্ন করা জরুরী। তাই প্রত্যেক নামাযীর কান ও মন আযান ও মসজিদের দিকে নিবদ্ধ থাকা চাই।

আযান

মুআয্যিন যখন আযান দেবেন তখন নিশ্চুপ থাকবেন এবং আযান শুনবেন। আযানের জবাব দেওয়া জরুরী। আযানের জবাব দেবেন এভাবে- মুআয্যিন যা বলবেন তা নিজেও বলতে থাকবেন। তবে যখন মুআয্যিন 'আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার্ রসূলুল্লাহ্' বলবেন তখন (১ম বারে) হুযূরের নাম শুনতেই দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুমু খাবেন আর ওই দু'টি নখ দু'চোখে মালিশ করবেন। এ কাজটি করতে করতে বলবেন 'আস্সালা-তু আস্সালা-মু আলায়কা ইয়া রসূলাল্লা-হ্'। মুআয্যিন যখন দ্বিতীয়বার 'মুহাম্মাদার রসূলুল্লাহ্' বলেন, তখন আপনি পুনরায় দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখে চুমু খাবেন আর দু'চোখে মসেহ করতে করতে বলবেন, ''ক্বুররাতু 'আয়নী- বিকা এয়া- রসূ-লাল্লা-হ্, আল্লা-হুম্মা মাত্তি'নী- বিসসাম'ই ওয়াল্ বাসার।'' তারপর মুআয্যিন যখন- 'হাইয়া আলাস্ সোয়ালাহ্' ও 'হাইয়া

আলাল্ ফালাহ্' বলবেন- তখন আপনি বলবেন, ''লা-হাওলা ওয়ালা-কূওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল আলিইয়্যিল আযীম।'' আযানের পরবর্তী কালেমাগুলোর উত্তরে মুআয্যিনের মতই বলবেন। তারপর নিম্নোক্ত আযানের দো'আ পড়ে মুনাজাত করবেন।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّآمَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَآئِمَةِ اٰتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدَ نِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامَ مَّحْمُوْدَ نِ الَّذِىْ وَعَدْتَهٗ ط وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ط اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ –

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা রব্বা হা-যিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তা-ম্মাতি ওয়াস্ সোয়ালা-তিল্ ক্বা-ইমাতি্ আ-তি সায়্যিদিনা- মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসী-লাতা ওয়াল্ ফাদ্বী-লাতা ওয়াদ্ দারাজাতার্ রফী-'আতা ওয়াব'আসহু- মাক্ব-মাম্ মাহমূদানিল্ লাযী ওয়া'আত্তাহ্; ওয়ার্ যুক্বনা- শাফা'আতাহূ- ইয়াওমাল্ ক্বিয়া-মাহ্; ইন্নাকা লা-তুখলিফুল মী'আ-দ।

উল্লেখ্য, মুআয্যিন আযানের কিছুক্ষণ পূর্বে উচ্চস্বরে দুরূদ শরীফ পড়বেন এবং মুআয্যিন ও শ্রোতাগণ সবাই আযানের পরে দরূদ শরীফ পড়ে উপরোক্ত দো'আ পড়বেন। ইক্বামতেরও একই নিয়মে জবাব দেওয়া যাবে। মুআয্যিন ইক্বামত বলার সময় মুক্বতাদীগণ বসে থাকবেন; মুআয্যিন যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সোয়ালা-হ্' বলবেন তখনই দাঁড়িয়ে জমা'আতে শামিল হবেন। এর পরবর্তীতে ডানে বামে দেখে কাতার সোজা করে নেবেন। প্রত্যেক রুকূ'-সাজদাবিশিষ্ট নামাযের ক্বা'দা বা বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়তে হয়।

তাশাহ্হুদ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِاللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ ؛ اَشْهَدُ اَنْ لَّآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

উচ্চারণ ঃ আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লা-হি ওয়াস্ সোয়ালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বোয়াইয়্যিবা-তু; আস্ সালা-মু 'আলায়কা আইয়্যুহান্ নাবিয়্যু ওয়া রহ্মাতুল্লা-হি ওয়াবারাকা-তুহ্; আস্সালা-মু 'আলায়না- ওয়া 'আলা- 'ইবা-দিল্লা-হিস্ সোয়া-লিহী-ন। আশহাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহূ ওয়া রসূ-লুহ্। প্রত্যেক নামাযের শেষ বৈঠকে (ক্বা'দাহ্-ই আখী-রাহ্) তাশাহ্হুদ পাঠের পর দুরূদ-ই ইব্রাহীমী শরীফ ও দো'আ-ই মা'সূরাহ্ পড়তে হয়।

দুরূদে ইব্রাহীমী শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ

عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرٰهِيْمَ ؛ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সোয়াল্লি 'আলা-সাইয়্যিদানা- মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা-আ-লি সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন কামা- সোয়াল্লায়্তা 'আলা- সাইয়্যিদিনা-ইব্রা-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা- ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামী-দুম্ মাজী-দ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা-সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা-আ-লি সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন, কামা- বা-রাক্তা 'আলা সাইয়্যিদিনা-ইব্রা-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা- ইব্রা-হী-মা ইন্নাকা হামী-দুম্ মাজী-দ।

দু'আ-ই মা'সূরাহ্

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ تَوَالَدَ وَلِأُسْتَاذِيْ وَلِشَيْخِيْ وَلِجَمِيْعِ
الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَلْأَحْيَآءِ مِنْهُمْ
وَالْأَمْوَاتِ اِنَّكَ سَمِيْعٌ قَرِيْبٌ مُّجِيْبُ الدَّعْوَاتِ ـ بِرَحْمَتِكَ
يَآأَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্ মাগ্ফির লী- ওয়ালিওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া লিমান তাওয়া-লাদা ওয়ালিউস্তা-যী- ওয়ালিশায়খী- ওয়ালিজামী-'ইল মু'মিনী-না ওয়াল্ মু'মিনা-তি, ওয়াল মুসলিমী-না ওয়াল মুসলিমা-তি; আল্ আহ্য়া-ই মিনহুম ওয়াল্ আমওয়া-ত্। ইন্নাকা সামী-'উন্ ক্বরী-বুম্ মুজী-বুদ্ দা'ওয়া-ত্। বিরাহ্মাতিকা এয়া-আর্ হামার্ রা-হিমী-ন।

অথবা

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ
فَاغْفِرْلِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمِ

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী- যোয়ালাম্তু নাফ্সী- যুল্মান্ কাসী-রাওঁ ওয়ালা-ইয়াগ্ফিরুয্ যুনূ-বা ইল্লা-আন্তা ফাগফির্লী- মাগ্ফিরাতাম্ মিন্ 'ইনদিকা ওয়ারহাম্নী- ইন্নাকা আন্তাল্ গফূ-রুর্ রাহী-ম।

বিতরের নামাযের তৃতীয় রাক্'আতে

সূরা ফাতিহা ও অন্য কোন সূরা মিলিয়ে পড়ার পর 'আল্লাহু আকবার' বলে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে তারপর হাত বেঁধে দো'আ কুনূত পড়তে হয়-

দু'আ কুনূত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ
وَنُثْنِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ؛ وَ نَشْكُرُكَ وَ لَانَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ
يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى
وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ
مُلْحِقٌ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্তা'ঈ-নুকা ওয়া নাস্তাগ্ফিরুকা ওয়া নু'মিনু বিকা ওয়া নাতাওয়াক্কালু 'আলায়কা ওয়া নুস্নী 'আলায়্কাল্ খায়র্। ওয়া নাশ্কুরুকা ওয়ালা- নাক্ফুরুকা ওয়া নাখ্লা'উ ওয়া নাত্রুকু মাইঁ ইয়াফ্জুরুকা। আল্লা-হুম্মা ইয়্যা-কা না'বুদু ওয়া লাকা নুসোয়াল্লী- ওয়া নাস্জুদু ওয়া ইলায়্কা নাস্'আ- ওয়া নাহ্ফিদু ওয়া নারজূ- রাহমাতাকা ওয়া নাখ্শা- 'আযা-বাকা ইন্না 'আযা-বাকা বিল কুফ্ফা-রি মুল্হিক্।

যেই সালাম বলে নামায থেকে বের হতে হয় :

ডানদিকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ; তারপর
বামদিকে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

উচ্চারণ ঃ আস্সালা-মু আলায়কুম্ ওয়া রহ্মাতুল্লাহ্ (ডান দিকে)
আস্সালা-মু আলায়কুম্ ওয়া রহ্মাতুল্লাহ্ (বাম দিকে)

সালাম ফিরিয়ে পড়বেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَاِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ ـ فَحَيِّنَا رَبَّنَا
بِالسَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আন তাস্ সালা-ম, ওয়া মিন্কাস্ সালা-ম, ওয়া ইলায়্কা ইয়ারজি'উস্ সালা-ম, ফাহাইয়্যিনা- রব্বানা-বিস্ সালা-ম, তাবা-রাক্তা রাব্বানা-ওয়া তা'আ-লায়্তা এয়া- যালজালা-লি ওয়াল্ ইক্রা-ম্।

নামাযের পর সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যাপক অর্থবোধক মুনাজাত ঃ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ
النَّارِ؛ بِرَحْمَتِكَ يَآأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ রব্বানা- আ-তিনা- ফিদ্ দুনয়া- হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল্ আ-খিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়া ক্বিনা- আযা-বান্ নার। বিরহ্মাতিকা এয়া-আর্হামার্ রা-হিমী-ন।

আরো ফরিয়াদ করতে পারেন-

اَللّٰهُمَّ اَعِنَّا عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ـ اَللّٰهُمَّ اَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْاُمُوْرِ كُلِّهَا وَاَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْاٰخِرَةِ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা আ'ইন্না-'আলা-যিক্‌রিকা ওয়া শুক্‌রিকা ওয়া হুস্‌নি 'ইবা-দাতিকা। আল্লা-হুম্মা আহ্‌সিন্‌ 'আ-ক্বিবাতানা-ফিল্‌ উমূ-রি কুল্লিহা- ওয়া আজির্‌না- মিন্‌ খিয্‌য়িদ্‌ দুন্‌য়া- ওয়া 'আযা-বিল্‌ আ-খিরাহ্‌।

নামাযের ফযীলত ও গুরুত্ব

নামায ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। নামায শ্রেষ্ঠতম ইবাদত। নামায মি'রাজের তোহ্‌ফা। নামায মু'মিনদের মি'রাজ; বরং ঈমানের পর শরীয়তের প্রথম বিধান হচ্ছে নামায। নামাযের অগণিত বরকত রয়েছে। হাদীস শরীফের কিতাবগুলোতে নামাযের এত বেশী ফযীলত বর্ণিত হয়েছে যে, সেগুলোর জন্য একটি পৃথক বড় কিতাবের প্রয়োজন হবে। বিশুদ্ধভাবে নামায সম্পন্ন করার ফলে মানুষের চরিত্র হয় সুন্দর। ইহজীবন হয় পবিত্র ও সুখী আর পরকালে লাভ হয় সাফল্য। কারণ, নামায হচ্ছে বেহেশ্‌তের চাবি। পক্ষান্তরে, ফরয নামাযকে অস্বীকার করা কুফর, আর নামাযকে ফরয জেনে না পড়া কবীরা গুনাহ্‌। নামাযে আলস্য করা কিংবা যথাযথভাবে না পড়া মুনাফিক্বের চিহ্ন।

নামাযের প্রকারভেদ

শরীয়তের বিধি অনুসারে চার ধরনের নামায রয়েছে। ১. ফরয, ২. ওয়াজিব, ৩. সুন্নাত এবং ৪.নফল। যে সমস্ত নামায সম্পন্ন করা একেবারে অপরিহার্য ওইগুলো ফরয। ফরয হওয়াকে অস্বীকার করা কুফর। শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া নামায বর্জনকারী ফাসিক্ব, কবীরাহ্‌ গুনাহ্‌কারী ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী।

(ফাতাওয়া-ই রেযভিয়াহ্‌)

ফরয আবার দুই প্রকার। ১. ফরযে আইন (অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে প্রত্যেককেই যা সম্পন্ন করতে হয়) এবং ২. ফরযে কিফায়া (যা সবার উপর ফরয হলেও কিছু সংখ্যক লোক তা সম্পন্ন করলে সবার পক্ষ থেকে ওই ফরয আদায় হয়ে যায়)। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্‌তের নামায 'ফরযে আইন' আর জানাযার নামায 'ফরযে কিফায়া'।

বিতরের নামায এবং দু'ঈদের নামায ওয়াজিব। অর্থাৎ সম্পন্ন করা অতি জরুরী। অস্বীকারকারী গোমরাহ্‌ ও বদমাযহাবী। শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া বর্জনকারী ফাসিক্ব ও জাহান্নামের শাস্তির উপযোগী।

যে সমস্ত নামায হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বেচ্ছায় সম্পন্ন করেছেন সেগুলো সুন্নাত। সুন্নাত দু'প্রকার। ১. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌ ও ২. সুন্নাতে

যা-ইদাহ্‌। ফজরের ফরয নামাযের পূর্বেকার দু'রাক্‌আত সুন্নাত, যোহরের ফরযের পূর্বেকার চার রাক'আত ও পরবর্তী দু'রাক্‌'আত সুন্নাত, মাগরিবের ফরয তিন রাক্‌'আতের পরবর্তী দু'রাক'আত, এশার ফরয চার রাক্‌'আতের পরবর্তী দু'রাক'আত, জুমু'আহ্‌'র ফরয দু'রাক্‌'আতের পূর্ববর্তী চার রাক্‌'আত, পরবর্তী চার ও দু'রাক'আত নামায সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্‌। এগুলো সম্পন্ন করা জরুরী। সম্পন্ন করলে বড় সাওয়াব রয়েছে। এগুলো হুযূর আক্বদাস্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রায় সব সময় সম্পন্ন করেছেন; অবশ্য কখনো বর্জনও করেছেন। সুতরাং এ নামাযগুলো ওয়াজিবের কাছাকাছি। ঘটনাচক্রে বাদ দিলে তিরস্কারের উপযোগী হবে আর সব সময় ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস করলে দোযখের শাস্তির উপযোগী হবে। আর আসর ও এশার ফরযের পূর্ববর্তী চার রাক'আত সুন্নাত হচ্ছে 'সুন্নাতে যা-ইদাহ্‌' অর্থাৎ মুআক্কাদাহ্‌ নয়। হুযূর আক্বদাস্‌ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এগুলো সম্পন্ন করেছেন। অবশ্য কখনো কখনো কোন ওজর ছাড়াও ছেড়ে দিয়েছেন। এমন সুন্নাত শরীয়তে এমনি যে, তা বর্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। সম্পন্ন না করলেও তিরস্কার কিংবা আযাব নেই। তবে সম্পন্নকারী সাওয়াব পাবেন।

উপরোক্ত নামাযগুলো ব্যতীত অন্য নামাযগুলো সুন্নাত-ই যা-ইদাহ্‌ কিংবা নফল। ওইগুলোও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজে এবং সাহাবা-ই কেরাম সম্পন্ন করেছেন। যেমন- শবে বরাত ও শবে ক্বদ্‌রের নামায, ইশ্‌রাক্ব, চাশ্‌ত (দ্বোহা) ও আউওয়াবীনের নামায ইত্যাদি। এগুলো পড়লে প্রচুর সাওয়াব হবে।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নাম ও সময়

মুসলমানদের উপর আল্লাহ্‌ দৈনিক ৫ ওয়াক্‌তের নামায ফরয করেছেন। ক্বোরআন-ই পাকের নিম্নোক্ত আয়াত শরীফ দ্বারা তা প্রমাণিত হয়-

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا وَمِنْ اٰنَآءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ○

অর্থাৎঃ হে হাবীব! আপনি আপনার রবের প্রশংসা সহকারে তাসবীহ পড়ুন সূর্যোদয়ের পূর্বে, সূর্যাস্তের পূর্বে এবং রাতের কিয়দংশের মধ্যে; অতঃপর তাসবীহ পড়ুন এবং দিনের পার্শ্বগুলোতে; নিশ্চয় আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

ফজরের সময় ঃ সুব্‌হি সাদিক্ব থেকে সূর্য উদয়ের পূর্ব পর্যন্ত এ নামাযের সময়।

যোহরের সময় ঃ মধ্যাহ্নকালে সূর্য পশ্চিম দিকে একটু গড়াতেই যোহরের ওয়াক্‌ত আরম্ভ হয় এবং কোন বস্তুর 'আসল ছায়া' বাদ দিয়ে সেটার ছায়া দ্বিগুণ লম্বা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যোহরের নামাযের সময়। সূর্য ঠিক মাথার উপরে থাকা অবস্থায় কোন একটি বস্তু সোজা করে খাড়া করলে যে ছায়া হয়, সেটাই 'আসল ছায়া'।

আসরের সময় ঃ যোহরের সময় শেষ হওয়ার সাথে সাথে আসরের সময় আরম্ভ হয় এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

মাগরিবের সময় ঃ সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাগরিবের সময় শুরু হয় এবং সন্ধ্যাকালে আকাশে লাল বর্ণের পর সাদা বর্ণের যে রেখাসমূহ দেখা যায়, সেগুলো অদৃশ্য হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাগরিবের সময় বহাল থাকে।

এশার সময় ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশার সময় শুরু হয় এবং তা সুবহি সাদিক্বের পূর্ব পর্যন্ত বলবৎ থাকে। অবশ্য রাত বারটার মধ্যে এ নামায পড়ে নেওয়া উচিত।

বিতরের সময় ঃ বিতরের নামায ফরয নয়, বরং ওয়াজিব। এ নামায পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে গণ্য নয়। তবুও বিতরের নামাযের সময় হচ্ছে, এশার নামাযের সময়ের মতই। এশার নামায সম্পন্ন করার পর থেকে বিতরের নামাযের সময় আরম্ভ হয়। এর পূর্বে পড়া যাবে না।

নামাযগুলোর উত্তম ওয়াক্ত

ফজরের নামায ওয়াক্তের মাঝামাঝি (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের ততক্ষণ পূর্বে আরম্ভ করবেন যেন নামায ৪০ আয়াত ক্বিরআত সহকারে সম্পন্ন করার পর তা কোন কারণ বশতঃ ভঙ্গ হয়ে গেলে পুনরায় একই পরিমাণ ক্বিরআত সহকারে সম্পন্ন করা যায়।) সময়ে পড়া উত্তম। যোহরের নামায শীতের মৌসুমে প্রথম ওয়াক্তে আর গ্রীষ্মের মৌসুমে একটু বিলম্ব করে পড়বেন। আসরের নামায মধ্যম ওয়াক্তের পরে আদায় করা উত্তম। তবে, সূর্যের রঙ হলদে হয়ে যাওয়ার পূর্বে পড়তে হবে। মাগরিবের নামায ওয়াক্ত আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথে আদায় করবেন। তবে রমযান মাসে ইফতার করার জন্য একটু বিলম্বে পড়লেও দোষ নেই। এশার নামায রাতের প্রথম তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করা মুস্তাহাব। [দুররে মুখতার] আকাশে যদি মেঘ থাকে এবং কাছে ঘড়ি বা সময় নির্ধারণের অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে আসরের নামায ও মাগরিবের নামায শেষ ওয়াক্তে পড়া উচিত। বিতরের নামায এশার নামাযের পরে পড়তে হবে। অবশ্য, যাঁরা নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে থাকেন এবং ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার নিশ্চিত ধারণা থাকে, তাহলে বিতরের নামায বিলম্বে পড়া উত্তম। অন্যথায় এশার নামাযের পরপরই সম্পন্ন করে নেবেন।

নামাযের নিয়্যতসমূহ

নামাযের নিয়্যত করা ফরয। অবশ্য মনে মনে নিয়ত করলেই ফরয আদায় হয়ে যায়। তবে মুখে নিয়্যত উচ্চারণ করা সুন্নাত। নিয়্যত আরবী বা মাতৃভাষার যেকোন একটিতে পড়লে যথেষ্ট হবে। কারণ, এটা মুস্তাহাব। নিম্নে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আরবী ভাষায় নিয়্যতসমূহ বাংলা উচ্চারণসহ উদ্ধৃত হল।

ফজরের নামায *৪ রাক'আত : ২ রাক'আত সুন্নাত এবং ২ রাক'আত ফরয ঃ*

ফজরের ২ রাক'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক্'আতাই সোয়ালা-তিল ফাজ্রি। সুন্নাতু রসূলিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে ফজরের দু'রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি; আল্লাহু আকবার।

ফজরের ২ রাক'আত ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক্'আতাই সোয়ালা-তিল ফাজ্রি। ফারদ্বুল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে ফজরের দু'রাক্'আত ফরয নামায আদায় করছি; আল্লাহু আকবার।

যোহরের নামায *সর্বমোট ১২ রাক'আত ঃ ৪ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্, ৪ রাক'আত ফরয, ২ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ ও ২ রাক'আত নফল।*

যোহরের ৪ রাক'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আ-তি সোয়ালা-তিয্ যোহ্রি। সুন্নাতু রসূলিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে যোহরের চার রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

যোহরের চার রাক'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ

রাক'আ-তি সোয়ালা-তিয্ যোহ্রি। ফারদ্বুল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে যোহরের চার রাক'আত ফরয নামায আদায় করছি; আল্লাহু আকবর।

যোহরের দুই রাক্'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিয্ যোহ্রি। সুন্নাতু রসূলিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে যোহরের দুই রাক'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিন্ নাফ্লি। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত নফল নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

আসরের নামায *৮ রাক্'আত ঃ ৪ রাক্'আত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্ এবং ৪ রাক্'আত ফরয।*

আসরের চার রাক'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আ-তি সোয়ালা-তিল আস্রি। সুন্নাতু রসূলিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে আসরের চার রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার

আসরের চার রাক'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ العَصْرِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আ-তি সোয়ালা-তিল আস্রি। ফারদ্বুল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে আসরের চার রাক্'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের নামায *সর্বমোট ৭ রাক্'আত ঃ ৩ রাক্'আত ফরয, ২ রাক্'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ এবং ২ রাক্'আত নফল।*

মাগরিবের তিন রাক'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা সালা-সা রাক'আ-তি সোয়ালা-তিল মাগরিবি। ফারদ্বুল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে মাগরিবের তিন রাক্'আত ফরয নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

মাগরিবের দুই রাক'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْمَغْرِبِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিল মাগরিবি। সুন্নাতু রসূলিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে মাগরিবের দুই রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই

সোয়ালা-তিন্ নাফ্লি। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক'আত নফল নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

এশার নামায *বিতর ও শাফী'উল বিতরসহ সর্বমোট ১৭ রাক'আত ঃ ৪ রাক'আত সুন্নাতে গায়রে মুআক্কাদাহ্, ৪ রাক'আত ফরয, ২ রাক'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্, ২ রাক'আত নফল, ৩ রাক'আত বিতর (ওয়াজিব) এবং ২ রাক'আত শাফী'উল বিতর (নফল)*

এশার চার রাক'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আ-তি সোয়ালা-তিল্ 'ইশা-ই। সুন্নাতু রসূ-লিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে এশার চার রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

এশার চার রাক'আত ফরযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আ-তি সোয়ালা-তিল 'ইশা-ই। ফারদ্বুল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে এশার চার রাক্'আত ফরয নামায আদায় করছি; আল্লাহু আকবার।

এশার দুই রাক'আত সুন্নাতের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْعِشَآءِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিল 'ইশা-ই। সুন্নাতু রসূ-লিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে এশার দুই রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিন্ নাফ্লি। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত নফল নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

বিতরের ৩ রাক্'আত ওয়াজিব নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى ثَلٰثَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ الْوِتْرِ ـ وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা সালা-সা রাক'আ-তি সোয়ালা-তিল্ ভিত্রি। ওয়া-জিবুল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে বিতরের তিন রাক্'আত ওয়াজিব নামায আদায় করছি। আল্লাহু আকবার।

বিতরের নামাযের পর দু'রাক্'আত নফল নামায পড়া উত্তম। এর প্রথম রাক্'আতে সূরা যিল্যাল (ইযা- যুলযিলাত) এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা 'কা-ফিরূন' পড়া ভাল। অন্যথায় অন্যান্য সূরাও পড়া যাবে। হাদীস শরীফে আছে- যদি রাতে কেউ তাহাজ্জুদের জন্য জাগ্রত হতে না পারে তবে এ দু'রাক্'আত নামায তাহাজ্জুদের স্থলাভিষিক্ত হবে। [বাহারে শরীয়ত]

উল্লেখ্য, এ দু'রাক্'আত নামাযকে 'শাফী'উল বিত্র' নামায বলা হয়। নফল'র নিয়্যতে এ নামায পড়তে হয়।

দু'রাক্'আত নফল (শাফী'উল বিত্র) নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিন্ নাফ্লি। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত নফল নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

বিঃদ্রঃ উপরোল্লিখিত নামাযগুলোর মধ্যে ফরযগুলো যদি জামা'আত সহকারে পড়েন, তাহলে নিয়্যতে **'মুতাওয়াজ্জিহান...'** এর পূর্বে **'ইক্বতাদাইতু বিহা-যাল ইমাম'** আর বাংলায় 'আদায় করছি'র পূর্বে 'এ ইমামের পেছনে' বর্দ্ধিত করবেন।

জুমু'আর নামায

জুমু'আহ্'র নামায ফরযে আইন। জুমু'আহ্ ফরয হবার তাকীদ যোহর অপেক্ষা বেশী। জুমু'আহ্ ফরয হওয়াকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির। [দুররুল মুখতার]
মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা রদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর আক্বদাস্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "যে ব্যক্তি উত্তমরূপে ওযূ করে, তারপর জুমু'আহ্ পড়তে আসে, খোৎবা শোনে ও চুপ থাকে, তার ওই সব গুনাহ্র মাগফিরাত হয়ে যায়, যা এ জুমু'আহ্ ও অন্য জুমু'আহ্র মধ্যবর্তীতে সম্পন্ন হয়।"
পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তিন জুমু'আহ্ আলস্য করে ছেড়ে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার হৃদয়ের উপর মোহর করে দেন। যে বিনা ওযরে তিন জুমু'আহ্ ছেড়ে দেয় সে মুনাফিক্ব, সে যেন ইসলামকে পৃষ্ঠপেছনে নিক্ষেপ করলো।

জুমু'আহ্র নামায *সর্বমোট ১৮ রাক্'আত ঃ ২ রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূ, ২ রাক্'আত দুখূলুল মাসজিদ, ৪ রাক্'আত ক্বাবলাল জুমু'আহ্ (সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্) ২ রাক্'আত ফরয, ৪ রাক্'আত বা'দাল জুমু'আহ্ (সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্), ২ রাক্'আত সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ এবং ২ রাক্'আত নফল।*

দু'রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূর নিয়্যত

উত্তমরূপে ওযূ করে মসজিদে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম দু'রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূর নামায পড়বেন। নিয়্যত করবেন এভাবে-

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাকা'আতাই সোয়ালা-তি তাহিয়্যাতিল ওযূ। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।
অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূর নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত দুখূলুল মসজিদ নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى

جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَر

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তি দুখূ-লিল্ মসজিদি মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।
অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত দুখূলুল মসজিদ'র নামায সম্পন্ন করছি; আল্লাহু আকবার।

চার রাক্'আত ক্বাবলাল জুমু'আহ্ নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ قَبْلِ الْجُمُعَةِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আতি সোয়ালা-তি ক্বাবলিল্ জুমু'আহ্; সুন্নাতু রসূ-লিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।
অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে চার' রাক্'আত ক্বাবলাল জুমু'আহ্র সুন্নাত নামায সম্পন্ন করছি; আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত জুমু'আহ্র ফরয নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُسْقِطَ عَنْ ذِمَّتِىْ فَرْضَ الظُّهْرِ بِاَدَآءِ رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ـ فَرْضُ اللّٰهِ تَعَالٰى، اَقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ، مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَر-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসক্বিত্বা 'আন্ যিম্মাতী ফারদ্বায্ যোহ্রি বিআদা-ই রাক্'আতাই সোয়ালা-তিল্ জুমু'আহ্; ফারদ্বুল্লা-হি তা'আ-লা, ইক্বতাদায়তু বিহা-যাল ইমা-ম, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।
অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে এ ইমামের পেছনে জুমু'আহ্র দু' রাক্'আত ফরয নামায আদায় করার মাধ্যমে যোহরের ফরয থেকে অব্যাহতি লাভের নিয়্যত করছি। আল্লাহু আকবার।

চার রাক্'আত বা'দাল জুমু'আহ্ নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتِ صَلٰوةِ بَعْدِ الْجُمُعَةِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ রাক'আতি

সোয়ালা-তি বা'দিল্ জুমু'আহ; সুন্নাতু রস-ূলিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে চার' রাক্'আত বা'দাল জুমু'আহ্র সুন্নাত নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত ওয়াক্বতের সুন্নাত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْوَقْتِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিল ওয়াক্বতি; সুন্নাতু রসূ-লিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত ওয়াক্বতের সুন্নাত নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

দু'রাক্'আত নফল নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ ـ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক'আতাই সোয়ালা-তিন্ নাফ্লি। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি। আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত নফল নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

ক্বাযা নামায

বিশেষ কারণ বশতঃ কোন ওয়াক্বতের নামায নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়তে না পারলে তা পরে সম্পন্ন করাকে 'ক্বাযা' বলে। কোন অনিবার্য কারণে অথবা ভুল বশতঃ নামায 'ক্বাযা' হয়ে গেলে ওই নামায সম্পন্ন করার পর ক্বাযা হবার জন্য আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা চাইবেন ও তাওবা করবেন।

ক্বাযা নামাযের নিয়ম

তারতীব অনুযায়ী ক্বাযা নামায সম্পন্ন করতে হয়। যেমন- কোন ব্যক্তির ফজর ও যোহরের নামায ক্বাযা হল। এমতাবস্থায় তাকে আসরের নামায পড়ার সময় সর্বপ্রথমে ফজর, তারপর যোহরের ক্বাযা সম্পন্ন করে তারপর আসরের নামায পড়তে হবে। পাঁচ ওয়াক্বত পর্যন্ত নামায ক্বাযা হলে এ ধারাবাহিক তারতীব পালন করতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তির যে কোন ওয়াক্বত হতে পাঁচ ওয়াক্বত নামায

ক্বাযা হয়, তাহলে এ পাঁচ ওয়াক্বতের পরে যে ওয়াক্বতের নামায আসবে ওই ওয়াক্বতের নামায আদায় করার সময় প্রথমে পূর্বের পাঁচ ওয়াক্বতের নামায ধারাবাহিকভাবে আদায় করে তারপর ওই ওয়াক্বতের নামায আদায় করবে। ক্বাযা নামায সম্পন্ন করার পূর্বে ওয়াক্বতিয়া নামায পড়লে তা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু নিম্নলিখিত তিনটি কারণে উল্লেখিত তারতীব পালন করতে হয় না-

☐ক্বাযা নামাযের কথা স্মরণ না থাকায় ওয়াক্বতিয়া নামায আদায় করলো। এমতাবস্থায় ওয়াক্বতিয়া নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।

☐যদি সময় এমন সঙ্কীর্ণ হয় যে, ক্বাযা আদায় করলে ওয়াক্বতিয়া নামায ক্বাযা হবার পূর্ণ আশঙ্কা থাকে। এমতাবস্থায় ওয়াক্বতিয়া নামায পড়ে নেবেন।

☐যদি ক্বাযা নামায ছয় বা ততোধিক হয়ে যায়। তাহলে তারতীব পালন করা জরুরি নয়, ছয় বা ততোধিক ওয়াক্বতের নামায ক্বাযা হলে ফজরের ক্বাযা ফজরের সময়, যোহরের ক্বাযা যোহরের সময় এবং আসরের ক্বাযা আসরের সময়ও করা যাবে।

উল্লেখ্য, ফরয নামাযের ক্বাযা সম্পন্ন করা ফরয। অনুরূপ ওয়াজিব ও সুন্নাতের ক্বাযা সম্পন্ন করা যথাক্রমে ওয়াজিব ও সুন্নাত।

ক্বাযা নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَقْضِىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ فَرْضِ الْفَجْرِ الْفَآئِتَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ: নাওয়াইতু আন্ আক্বদ্বিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই সোয়ালা-তি ফারদ্বিল ফাজ্রিল্ ফা-ইতাতি; মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আক্বার।

☐এভাবে, তিন্ রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযায় 'রাক্'আতাই' এর স্থলে 'সালাসা রাক্'আতে' এবং চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের ক্বাযায় 'আর্বা'আ রাক্'আতে' বলতে হবে। আর ওয়াক্বত অনুসারে 'ফাজরিল'-এর স্থলে 'যোহরিল', 'আসরিল' ইত্যাদি বলতে হবে।

☐যদি ফজরের নামাযের জামা'আত আরম্ভ হয়ে যায়, তখন আন্দাজ করবেন- যদি সুন্নাত পড়ে জামা'আতে শামিল হওয়া যাবে বলে মনে হয়, তবে সুন্নাত পড়ে জামা'আতে শামিল হবেন। অন্যথায়, সুন্নাত না পড়ে জামা'আতে শামিল হয়ে যাবেন। আর ওই সুন্নাত সূর্য উঠার পর থেকে দ্বিপ্রহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পড়ে নেবেন। আর যদি সুন্নাত ও ফরয উভয়ই ক্বাযা হয়ে যায়, তবে সুন্নাত ও ফরয উভয়টি সূর্য উদয়ের পর থেকে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পড়ে নেবেন।

☐ যোহর, আসর ও এশার ফরয নামাযের ইক্বামত আরম্ভ হয়ে গেলে ফরযের পূর্ববর্তী সুন্নাতের নিয়্যত না করে জামা'আতে শামিল হয়ে যাবেন। আর যদি সুন্নাত আরম্ভ করার পর ইক্বামত আরম্ভ হয়, তবে সুন্নাত সম্পন্ন করে জামা'আতে

শামিল হওয়া যাবে বলে মনে হলে, সুন্নাত শেষ করে জামা'আতে শামিল হবেন। অন্যথায় দুই রাক্'আত পূর্ণ করে অথবা ওই নিয়্যত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শামিল হয়ে যাবেন। তারপর যোহর ও এশার ফরযের পরবর্তী সুন্নাত দুই রাক্'আতের পর যোহর ও এশায় পূর্বের ছেড়ে দেওয়া চার রাক্'আত সুন্নাত নামায আদায় করে নেবেন।

☐ জুমু'আর নামায কোন কারণে আদায় করতে না পারলে জুমু'আর পরিবর্তে যোহরের নামায আদায় করবেন।

☐ সফরকালীন ক্বাযা নামায মুক্বীম হওয়ার পরও 'ক্বসর' হিসেবে সম্পন্ন করবেন। আর মুক্বীম থাকাকালীন ক্বাযা নামায সফরে সম্পন্ন করলেও পুরোপুরি আদায় করতে হবে, ক্বসর সহকারে নয়।

সাজদাহ্-ই সাহ্ভ

নামাযের ওয়াজিবগুলোর (পূর্বে উল্লিখিত)কোন একটি বাদ পড়লে সাজদাহ্-ই সাহ্ভ বা ভুলসংশোধনী সাজদাহ্ দিতে হয়।

সাজ্দাহ্-ই সাহ্ভ আদায়ের নিয়ম

শেষ বৈঠকে শুধু তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যা-তু) পাঠ করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে নামাযের সাজদার মত দু'টি সাজদাহ্ করবেন। প্রত্যেক সাজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ্ পাঠ করবেন, তারপর বসে পুনরায় তাশাহ্হুদ, দরূদ-ই ইব্রাহীমী শরীফ ও দো'আ-ই মা'সূরা পড়ে যথারীতি সালাম ফেরাবেন।

☐ তিন বা চার রাক্'আত বিশিষ্ট নামাযের প্রথম বৈঠকে তাশাহ্হুদের পর ভুলবশতঃ দরূদ-ই ইব্রাহীমী শরীফ থেকে 'আল্লাহুম্মা সল্লি 'আলা সায়্যিদিনা মুহাম্মাদিন' পর্যন্ত পড়লেও সাজদাহ্-ই সাহ্ভ ওয়াজিব হবে।

শব-ই বরাত

অর্ধ শা'বান অর্থাৎ ১৪ শা'বান দিবাগত রাত 'শবে বরাত'। এ রাত জাগ্রত র'য়ে ইবাদত-বন্দেগী করার বহু ফযীলত রয়েছে। এ রাতে বেশি পরিমাণে নফল নামায আদায় করলেও বড় সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। দু'দু' রাক্'আত নফল নামাযের নিয়্যত করে কমপক্ষে ১২ রাক্'আত এবং এর বেশী যত রাক্'আত সম্ভব হয় পড়া যায়। শব-ই বরাত ও শব-ই ক্বদ্র'র নফল নামাযসমূহ একাকি ও জামা'আত উভয়ভাবে পড়া যায়। নিয়্যত নিম্নরূপ-

শবে বরাত নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْبَرَآئَةِ
مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাকা'আতাই সোয়ালা-তি লায়লাতিল্ বারা-আতি; মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্

শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত লায়লাতুল বরাতের নামায সম্পন্ন করছি; আল্লাহু আকবার।

রোযা

শা'বানের পর আসে মাহে রমযান। পবিত্র রমযান এক মাসের রোযা রাখা প্রত্যেক বালেগ-আক্বেল মুসলমানের উপর ফরয। কেউ শরীয়ত সম্মত কারণে রোযা রাখতে অপারগ হলে প্রত্যেক রোযার জন্য 'ফিদিয়া' দিতে হয়। রোযা পালনের জন্য নিয়্যত করতে হয়। সারাদিন রোযা পালনের পর সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফ্তার করতে হয়। সুতরাং রোযা ও ইফ্তারের নিয়্যত নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

রোযার নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اَصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضًا لَّكَ
يَا اَللّٰهُ فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ -

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ আসূ-মা গাদাম্ মিন শাহ্রি রামাদ্বা-নাল মুবারাক; ফারদ্বাল্ লাকা ইয়া-আল্লা-হু, ফাতাক্বাব্বাল্ মিন্নী- ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল্ 'আলী-ম।

অর্থঃ আমি আগামীকাল পবিত্র রমযান মাসের ফরয রোযা রাখার নিয়্যত করলাম। হে আল্লাহ্! তুমি এটা আমার নিকট থেকে ক্বূবল কর; নিশ্চয় তুমি শ্রোতা, জ্ঞাতা। আর যদি পরদিন দ্বি-প্রহরের পূর্বে নিয়্যত করা হয়, তবে 'আসূমা' শব্দের পরে 'গদাম্' শব্দটি না বলে 'আল্ ইয়াওমা' বলবেন। এ শব্দের অর্থ 'আজ'।

ইফ্তারের নিয়্যত

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ اَفْطَرْتُ
بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা লাকা সুম্তু ওয়া 'আলায়কা তাওয়াক্কাল্তু ওয়া 'আলা-রিয্ক্বিকা আফ্ত্বার্তু বিরাহ্মাতিকা ইয়া-আর্ হামার্ রা-হিমী-ন।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! তোমারই (সন্তুষ্টির) জন্য আমি রোযা রেখেছি তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমারই রিয্ক্বের উপর ইফ্তার করছি, তোমার দয়া সহকারে, হে সর্বাধিক দয়ালু।

তারাবীহ্

পবিত্র রমযানের প্রত্যেক রাতে এশা ও বিতরের নামাযের মধ্যভাগে দু'দু'রাক্'আত করে বিশ রাক্'আত তারাবীহর নামায পড়ার বিধান রয়েছে।

তারাবীহর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّرَاوِيْحِ ـ سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ

تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাকা'আতাই সোয়ালা-তিত্ তারা-ভী-হ্। সুন্নাতু রসূ-লিল্লা-হি তা'আ-লা মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত তারাবীহ্র সুন্নাত নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

প্রতি দুই রাক্'আত নামাযের পর দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَشَفِيْعِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ -

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সল্লি আ'লা- সাইয়্যিদিনা- ওয়া নাবিয়্যিনা- ওয়া শাফী-'ইনা- ওয়া মাওলা-না- মুহাম্মাদিন্ সাল্লাল্লা-হু আলায়হি ওয়া আ-লিহী ওয়া আসহা-বিহী ওয়া বারিক্ ওয়া সাল্লিম।

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّىْ يَاكَرِيْمَ الْمَعْرُوْفِ وَيَا قَدِيْمَ الْاِحْسَانِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلٰى دِيْنِكَ بِرَحْمَتِكَ يَاارْحَمَ الرّٰاحِمِيْنَ -

উচ্চারণ: হা-যা- মিন্ ফাদ্বলি রব্বী- ইয়া- কারী-মাল্ মা'রূ-ফ, ওয়া ইয়া-ক্বাদী-মাল ইহ্সা-ন, ওয়া সাব্বিত্ ক্বল্বী- 'আলা- দী-নিকা, বিরহ্মাতিকা ইয়া-আর্হামার্ রা-হিমীন।

প্রতি চার রাক্'আত তারাবীহ্ নামাযের পর দো'আ

سُبْحٰنَ ذِى الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوْتِ سُبْحٰنَ ذِى الْعِزَّةِ وَالْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْكِبْرِيَآءِ وَالْجَبَرُوْتِ - سُبْحٰنَ الْمَلِكِ الْحَيِّ الَّذِىْ لَايَنَامُ وَلَا يَمُوْتُ اَبَدًا اَبَدًا - سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَآئِكَةِ وَالرُّوْحِ -

উচ্চারণ ঃ সুবহা-না যিল মুল্কি ওয়াল মালাকূতি, সুবহা-না যিল্ 'ইয্যাতি ওয়াল 'আয্মাতি ওয়াল্ হায়বাতি ওয়াল্ ক্বুদ্রাতি ওয়াল্ কিবরিয়া-ই ওয়াল্ জাবারূ-তি, সুবহা-নাল মালিকিল হাইয়্যিল লাযী- লা-ইয়ানা-মু ওয়ালা- ইয়ামূ-তু আবাদান্ আবাদা-। সুব্বূ-হুন ক্বুদ্দূ-সুন রাব্বুনা-ওয়া রাব্বুল মালা-ইকাতি ওয়ার্ রূ-হ্।

তারাবীহ্ নামাযের প্রতি চার রাক্'আত পর মুনাজাত

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوْذُبِكَ مِنَ النَّارِ، يَاخَالِقَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بِرَحْمَتِكَ يَاعَزِيْزُ يَاغَفَّارُ يَاكَرِيْمُ يَاسَتَّارُ يَارَحِيْمُ يَاجَبَّارُ يَاخَالِقُ يَابَارُّ-

اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا وَخَلِّصْنَا مِنَ النَّارِ يَامُجِيْرُ، يَامُجِيْرُ، يَامُجِيْرُ، بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্না- নাস্আলুকাল্ জান্নাতা ওয়া না'ঊ-যুবিকা মিনান্ না-র, ইয়া খা-লিক্বাল জান্নাতি ওয়ান্ না-র; বিরাহ্মাতিকা ইয়া- আযী-যু ইয়া গাফ্ফা-রু ইয়া কারী-মু ইয়া সাত্তা-রু ইয়া রাহী-মু ইয়া জাব্বা-রু ইয়া খা-লিক্ব ইয়া বা-র্। আল্লা-হুম্মা আজিরনা ওয়া খাল্লিসনা- মিনান্ না-র্। ইয়া- মুজী-রু ইয়া মুজী-রু ইয়া মুজী-র, বিরাহ্মাতিকা ইয়া-আর্ হামার্ রা-হিমী-ন।

শব-ই ক্বদর

পবিত্র রমযানের শেষ দশ দিনের বিজোড় রাতগুলোর একটি 'শব-ই ক্বদর'। তবে ২৬ রমযান দিবাগত রাতে শব-ই ক্বদর হবার সম্ভাবনা বেশি। সুতরাং শব-ই ক্বদরে সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত-বন্দেগী করলে হাজার মাসেরও বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। শব-ই বরাতের মত এ রাতেও নফল নামায পড়ার বিধান রয়েছে।

শব-ই ক্বদর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ- مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাকা'আতাই সোয়ালা-তি লায়লাতিল ক্বদ্রি। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত লায়লাতুল ক্বদ্রের নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

ই'তিকাফ

ই'তিকাফ-এর নিয়্যতে মসজিদে অবস্থান করার নাম ই'তিকাফ। ই'তিকাফ তিন প্রকার- ১.ওয়াজিব, ২. সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্ ও ৩. মুস্তাহাব।

ই'তিকাফ-ই ওয়াজিব

এটা মান্নতের ই'তিকাফ। এটা পালনের জন্য রোযা রাখা অত্যাবশ্যক। রোযা ব্যতীত এটা বিশুদ্ধ হয় না।

ই'তিকাফ-ই সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্

এটা রমযান মাসের পূর্ণ শেষ দশদিনে করা হয়। ২০ রমযান সূর্যাস্তের সময় বা পূর্বে ই'তিকাফের নিয়্যতে মসজিদে উপস্থিত হতে হয়। আর ৩০ রমযান সূর্যাস্তের পর অথবা ২৯ রমযান শাওয়ালের চাঁদ দৃষ্ট হওয়ার পর মসজিদ থেকে বের

হবেন। অন্যথায় এ পর্যায়ের ই'তিকাফ সম্পন্ন হবে না। এ ই'তিকাফ হচ্ছে সুন্নাত-ই মুআক্কাদাহ্-ই কিফায়া। সবাই ছেড়ে দিলে সবাইকে পাকড়াও করা হবে। আর যদি একজনও তা সম্পন্ন করে নেন, তবে সবাই দায়িমুক্ত হয়ে যাবেন। এ ই'তিকাফের জন্যও রোযা রাখা পূর্বশর্ত। তবে রমযানের রোযাগুলোই তজ্জন্য যথেষ্ট। [হেদায়া ইত্যাদি]

মুস্তাহাব ই'তিকাফ

উপরোক্ত দু'প্রকারের ই'তিকাফ ব্যতীত যে ই'তিকাফ করা হয় তা' মুস্তাহাব। এ ই'তিকাফের জন্য রোযা পূর্বশর্ত নয়। এটা কিছুক্ষণের জন্যও হতে পারে। মসজিদে যখনই যাবেন এ ই'তিকাফের নিয়্যত করে নেবেন। মসজিদ থেকে বের হতেই এ ই'তিকাফ খতম হয়ে যায়। এতে মুস্তাহাব ই'তিকাফের নিয়্যত করাই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য, পুরুষের ই'তিকাফের জন্য মসজিদ জরুরি আর মেয়েদের জন্য নিজ ঘরের একটি বিশেষ জায়গা।

ঈদুল ফিত্বর

পবিত্র রমযানের এক মাস রোযা পালনের পর শাওয়ালের চাঁদ উদিত হলে ১ শাওয়াল যে ঈদের নামায আদায় করা হয়, তা 'ঈদুল ফিত্বর'র নামায। অতিরিক্ত ৬ তাকবীর সহকারে দু'রাক'আতের নিয়্যতে ঈদের নামায আদায় করা ওয়াজিব।

ঈদুল ফিত্বর নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْفِطْرِ، مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ، وَاجِبُ اللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা রাক্'আতাই সোয়ালা-তি ঈ-দিল ফিত্বরি, মা'আ সিত্তি তাকবী-রা-তিন; ওয়া-জিবুল্লা-হি তা'আ-লা- ইক্বতাদায়তু বিহা-যাল ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

ঈদুল আদ্বহা

যিলহজ্ব মাসের ১০ম তারিখে পালনীয় ঈদোৎসবকে ঈদুল আদ্বহা বলা হয়। 'আদ্বহা'র এক অর্থ ক্বোরবানী করা। এ ঈদে ক্বোরবানী করা হয় বলেই এর এরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এ ঈদেও ঈদুল ফিত্বরের ন্যায় অতিরিক্ত ৬ তাকবীরের সাথে ২ রাক'আত ওয়াজিব নামায আদায় করতে হয়। এ নামাযের পূর্বশর্ত, নিয়ম-কানুন, বিধি-বিধান কিছুটা ব্যতিক্রম সহকারে ঈদুল ফিত্বর নামাযের অনুরূপ। এতেও দু'টি খোৎবাহ্ পাঠ করতে হয়।

ঈদুল আদ্বহা নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ عِيْدِ الْأَضْحٰى - مَعَ سِتِّ تَكْبِيْرَاتٍ، وَاجِبُ اَللّٰهِ تَعَالٰى اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লাহি তা'আ-লা রাক্'আতাই সোয়ালা-তি ঈ-দিল আদ্বহা, মা'আ সিত্তি তাকবী-রা-তিন; ওয়া-জিবুল্লা-হি তা'আ-লা ইক্বতাদায়তু বিহা-যাল ইমাম, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

উভয় ঈদের নামাযের নিয়ম

প্রথমে ইমাম সাহেবের সাথে উভয় কান পর্যন্ত হাত তুলে 'আল্লাহু আকবার (তাকবীর-ই তাহরীমাহ্) বলে দু'হাত বেঁধে নেবেন। তারপর 'সানা' পড়ে উভয় কান পর্যন্ত হাত তুলবেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দেবেন। আবার হাত উঠাবেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত ছেড়ে দেবেন। আবার হাত উঠাবেন এবং 'আল্লাহু আকবার' বলে হাত বেঁধে নেবেন। অর্থাৎ প্রথম তাকবীরে (তাকবীর-ই তাহরীমায়) হাত বাঁধবেন, এর পরবর্তী দু'তাকবীরে হাত ঝুলিয়ে দেবেন এবং চতুর্থ তাকবীরে হাত বেঁধে নেবেন। এখানে এ কথা স্মরণ রাখবেন যে, যেখানে তাকবীরের পর কিছু পড়তে হয়, সেখানে হাত বাঁধতে হয়। আর যেখানে কিছু পড়তে হয় না। সেখানে হাত ঝুলিয়ে দিতে হয়।

তারপর ইমাম আ'ঊযু বিল্লাহ্ ও বিস্মিল্লাহ্ নীরবে পড়ে উচ্চরবে সূরা ফাতিহাসহ অন্য সূরা পড়বেন; তারপর রুকূ'-সাজদাহ্ করে প্রথম রাক'আত সমাপ্ত করবেন। তারপর দ্বিতীয় রাক'আতে প্রথমে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পড়ার পর তিন বার হাত উভয় কান পর্যন্ত উঠাবেন এবং প্রত্যেক বারে তাকবীর বলাকালে হাত না বেঁধে ঝুলিয়ে দেবেন। তারপর 'আল্লাহু আকবার' (এটা চতুর্থ তাকবীর) বলে রুকূ'তে যাবেন।

এতে বুঝা গেল যে, প্রথম রাক'আতে তিনটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে তিনটি করে অতিরিক্ত ছয়টি তাকবীর হল। প্রথম তিন তাকবীর ক্বিরআতের আগে ও তাকবীরে তাহরীমার পরে। আর অবশিষ্ট তিন তাকবীর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরআতের পরে ও রুকূ'র তাকবীরের আগে সম্পন্ন করতে হয়। এ ছয় তাকবীরেই দু'হাত উভয় কান পর্যন্ত উঠাতে হয়। প্রত্যেক দু'তাকবীরের মধ্যখানে তিন তাসবীহ্ পরিমাণ বিরতি দিতে হয়। [দুররে মুখতার, ১ম খন্ড, ৭৭৯ পৃষ্ঠা ইত্যাদি]

□ কোন স্থানে ইমাম যদি ৬ এর বেশি অতিরিক্ত তাকবীর বলে, তবে মুক্বতাদীগণও তাঁর অনুসরণ করবেন; তবে উভয় রাক'আতে সর্বমোট ১৩ তাকবীরের বেশিতে অনুসরণ করবেন না। [প্রাগুক্ত, ৭৮০পৃ.]

☐ কোন শরীয়তসম্মত কারণে ঈদুল ফিত্‌রের দিন ঈদের নামায হতে না পারলে দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে। দ্বিতীয় দিনেও সম্ভব না হলে তৃতীয় দিন পড়া যাবে না। কিন্তু কোন ওযর ছাড়া প্রথম দিন ঈদুল ফিত্‌রের নামায আদায় না করলে দ্বিতীয় দিন পড়তে পারবে না। [ক্বাযীখান, আলমগীরী, দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত, ক্বানূন-ই শরীয়ত]

☐ ঈদুল আদ্‌হার নামায ওযরের কারণে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত পড়া যাবে; মাকরূহও হবে না। ১২ তারিখের পর পড়া যাবে না। বিনা ওযরে ১০ তারিখের পরে পড়াও মাকরূহ। [ক্বাযীখান, আলমগীরী ইত্যাদি]

☐ যিলহজ্ব মাসের ৯ তারিখে ফজর থেকে ১৩ তারিখের আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নামাযের পর 'তাকবীর-ই তাশরীক্ব' পড়তে হয়। 'তাকবীর-ই তাশরীক্ব' নিম্নরূপ:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ

উচ্চারণ: আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার; ওয়া লিল্লা-হিল হাম্‌দ।

কতিপয় নফল রোযার বিবরণ

☐**আশূরা:** ১০ মুহার্‌রমের রোযা। উত্তম হচ্ছে ৯ মুহার্‌রমও রোযা রাখা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আশূরার রোযা রেখেছেন। মুসলমানদেরকেও এর রোযা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর এরশাদ করেছেন, ''রমযানের পর উত্তম হচ্ছে মুহার্‌রমের রোযা।'' [বোখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী শরীফ]

আরো এরশাদ করেছেন, ''আশূরার রোযা এক বছরের গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেয়।'' [মুসলিম শরীফ]

☐**আরফাহ্:** অর্থাৎ ৯ যিলহজ্বের রোযা। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আর্‌ফার রোযা এক বছর আগের ও এক বছর পরের গুনাহ্ নিশ্চিহ্ন করে দেয়। [মুসলিম, আবূ দাউদ ইত্যাদি]

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আন্‌হা বলেছেন, ''রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আরফাহ্'র দিনের রোযাকে হাজার দিনের সমান বলেছেন। তবে হজ্ব পালনকারীদেরকে, যারা আরফাতে থাকে, তাদেরকে ওই দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন। [বায়হাক্বী, ত্বরানী, আবূ দাউদ ও নাসাঈ]

☐**আইয়্যাম-ই বীদ্ব:** অর্থাৎ প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, প্রতি মাসের তিন দিনের রোযা তেমনি, যেমন সব সময়ের রোযা। [বোখারী ও মুসলিম শরীফ]

☐**সোম ও বৃহস্পতিবারের রোযা:** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলগুলো আল্লাহ্‌র দর্‌বারে পেশ করা হয়। সুতরাং আমি চাই আমার আমল এমতাবস্থায় পেশ হোক যখন আমি রোযাদার অবস্থায় থাকি।''

☐**বুধবার ও বৃহস্পতিবারের রোযা:** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, ''যে ব্যক্তি বুধবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখবে তার জন্য দোযখ থেকে মুক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে।'' আরো এরশাদ ফরমায়েছেন, ''বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার রোযা পালনকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'আলা বেহেশ্‌তে এমন এক (সুন্দর) ঘর তৈরি করবেন, যার বাইরে থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাইরে দেখা যাবে।'' উল্লেখ্য, কেবল শুক্রবার (১দিন) রোযা পালন করা মাকরূহ। অবশ্য, পূর্ব কিম্বা পরবর্তী দিনের অন্যান্য রোযা মিলিয়ে রাখবেন। কারণ, নফল ও সুন্নাত রোযা কেবল ১টি রাখা মাকরূহ। [ক্বানূন-ই শরীয়ত]

☐**শাওয়ালের ৬ রোযা:** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রেখেছে তারপর শাওয়ালের ৬দিন রোযা পালন করেছে, সে তেমনি যেমন সব সময় রোযা রেখেছে।'' আরো এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি ঈদের পর (ঈদুল ফিত্‌র) ৬টি রোযা রেখেছে সে পূর্ণ বছরই রোযা রেখেছে।'' [মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ইত্যাদি]

উল্লেখ্য, মাঝে মাঝে বাদ দিয়ে এ রোযা পালন করা উত্তম। ঈদের পর লাগাতার ৬দিন রোযা রাখলেও ক্ষতি নেই।[দুররে মুখতার ও বাহারে শরীয়ত]

☐**শা'বানের রোযা ও ১৫ শা'বানের ফযীলত:** রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যখন শা'বানের ১৫ তারিখ আসে তখন ওই রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগী কর এবং দিনের বেলায় রোযা রাখ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা ওই দিন সূর্যাস্তের পর থেকে প্রথম আসমানের দিকে বিশেষ তাজাল্লি বিচ্ছুরিত করেন এবং এরশাদ ফরমান- 'কেউ ক্ষমা চাওয়ার আছ কি? তাকে ক্ষমা করব। কেউ রুজি চাওয়ার আছ কি? তাকে রুজি দেব। কোন বিপদ থেকে মুক্তিকামী আছ কি? তাকে বিপদমুক্ত করব। কেউ এমনি, কেউ এমনি আছ কি ? তাকে তা-ই দেব।' এমনি ভোর হওয়া পর্যন্ত আহ্বান করেন।'' [ইবনে মাজাহ]

আরো এরশাদ ফরমান, শা'বানের ১৫ তারিখ (শব-ই বরাত) আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত সৃষ্টির দিকে বিশেষ তাজাল্লী প্রতিফলিত করেন এবং সবাইকে ক্ষমা করে দেন- কাফির ও শত্রুতা পোষণকারীগণ ব্যতীত। [তাবরানী, ইবনে হাব্বান]

অবশ্য অন্যান্য হাদীস শরীফে আরো কতিপয় মহাপাপীর কথাও বর্ণিত হয়েছে, যাদের গুনাহ্ এমন রাতেও ক্ষমা হয়না। যেমন- মাতাপিতার অবাধ্য, মাদকাসক্ত, যাদুকর ও ব্যভিচারী ইত্যাদি।

জানাযার নামায

জানাযার নামাযের নিয়ম

নিয়্যত

نَوَيْتُ أَنْ أُؤَدِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتِ صَلٰوةِ الْجَنَازَةِ فَرْضِ الْكِفَايَةِ وَالثَّنَآءَ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَالصَّلٰوةَ عَلَى النَّبِيِّ وَالدُّعَآءَ لِهٰذَا الْمَيِّتِ اِقْتَدَيْتُ بِهٰذَا الْاِمَامِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উআদ্দিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা আরবা'আ তাক্বীরা-তি সোয়ালা-তিল্ জানা-যাতি ফারদ্বিল কিফা-য়াতি ওয়াস্ সানা-আ লিল্লা-হি তা'আ-লা- ওয়াস্ সোয়ালা-তা আলান্ নাবিয়্যি ওয়াদ্ দু'আ-আ লিহা-যাল মাইয়্যিতি, ইক্বতাদায়তু বিহা-যাল ইমা-ম, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা-জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আক্বার।

উল্লেখ্য, মেয়েলোক হলে 'লিহা-যাল মাইয়্যিতি'-এর পরিবর্তে 'লিহা-যিহিল মাইয়্যিতি' বলবেন।

এরপর পড়বেন-

জানাযার নামাযের সানা (১ম তাকবীরের পর)

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَ تَعَالٰى جَدُّكَ وَجَلَّ ثَنَآءُكَ وَلَآاِلٰهَ غَيْرُكَ-

উচ্চারণ ঃ সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবা-রাকাস্মুকা ওয়া তা'আ-লা- জাদ্দুকা ওয়া জাল্লা সানা-উকা ওয়া লা-ইলা-হা গা-য়রুকা।

এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে (হাত না উঠিয়ে) পড়বেন-

জানাযার নামাযের দরূদ শরীফ (২য় তাকবীরের পর)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَسَلَّمْتَ عَلٰى سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَآ اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ - اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰٓى اٰلِ سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيْمَ، اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা সোয়াল্লি ওয়া সাল্লিম 'আলা- সাইয়্যিদানা- মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন কামা- সোয়াল্লায়্তা ওয়া সাল্লাম্তা 'আলা- সাইয়্যিদিনা- ইব্রা-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা ইব্রা-হী-মা,

ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বা-রিক 'আলা-সাইয়্যিদিনা- মুহাম্মাদিন, ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন, কামা- বা-রাক্তা 'আলা-সাইয়্যিদিনা- ইব্রা-হী-মা ওয়া 'আলা- আ-লি সাইয়্যিদিনা- ইব্রা-হী-মা; ইন্নাকা হামী-দুম্ মাজী-দ। *এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলে (হাত না উঠিয়ে) পড়বেন*

(মাইয়্যেত বালেগ হলে)

জানাযার নামাযের দো'আ (৩য় তাকবীরের পর)

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَاوَمَيِّتِنَاوَشَاهِدِنَا وَغَآئِبِنَاوَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا، اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاَحْيِهٖ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ؛ بِرَحْمَتِكَ يَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাগ্ফির্ লিহাইয়্যিনা- ওয়া মাইয়্যিতিনা- ওয়া শা-হিদিনা- ওয়া গা-ইবিনা- ওয়া সাগী-রিনা- ওয়া কাবী-রিনা- ওয়া যাকারিনা- ওয়া উন্সা-না- আল্লা-হুম্মা মান্ আহ্য়াইতাহূ- মিন্না- ফাআহ্য়িহী- 'আলাল ইস্লা-ম। ওয়া মান্ তাওয়াফ্ফায়্তাহূ- মিন্না- ফাতাওয়াফ্ফাহূ- 'আলাল ঈমা-ন। বিরাহ্মাতিকা ইয়া-আর্হামার্ রা-হিমী-ন।

নাবালেগ বালকের জানাযার নামাযের দো'আ

(৩য় তাকবীরের পর)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَّمُشَفَّعًا-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ্'আল্হু লানা-ফারাত্বাওঁ ওয়াজ্ 'আল্হু লানা-আজ্রাওঁ ওয়া যুখরাওঁ ওয়াজ্'আল্হু লানা- শা-ফি'আওঁ ওয়া মুশাফ্ফা'আ-।

নাবালেগ বালিকার জানাযার নামাযের দো'আ

(৩য় তাকবীরের পর)

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا لَنَا فَرَطًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا اَجْرًا وَّذُخْرًا وَّاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَّمُشَفَّعَةً-

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মাজ্'আল্হা- লানা- ফারাত্বাওঁ ওয়াজ্'আল্হা- লানা-আজ্রাওঁ ওয়া যুখ্রাওঁ ওয়াজ্'আল্হা- লানা- শা-ফি'আতাওঁ ওয়া মুশাফ্ফা'আহ্।

এখন চতুর্থ তাকবীর বলে সালাম ফেরাবেন।

☐ আমাদের দেশে জানাযার নামায শেষে কেউ 'লোকটি কেমন ছিল?' বলার পর সকলে 'লোকটি ভাল ছিল' বলার যে নিয়ম রয়েছে তা সহীহ হাদীস শরীফ সম্মত। এতে মৃতব্যক্তির পক্ষে মুসলমানদের ভাল সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় এবং তা দ্বারা মৃতের উপকার হয়।

□ জানাযার নামাযের পর কিছু সূরা ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পড়ে মৃত ও জীবিত উভয়ের জন্য দো'আ করা উত্তম।

কবর যিয়ারত

কবরস্থানে গিয়ে ক্বোরআন-ই পাকের সূরা-ক্বিরআত, দো'আ ও তাসবীহ-তাহলীল পড়ে মুর্দার রূহের প্রতি সাওয়াব বখশিশ করলে মুর্দা এবং যিয়ারতকারী উভয়ের ফায়দা হয়। খোদ্ রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও কবর যিয়ারত করেছেন। কবরস্থানে গিয়ে যিয়ারত শুধু পুরুষরাই করবে। স্ত্রীলোকগণ কবরস্থানে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়।

যিয়ারতের নিয়ম

কবর যিয়ারতের নিয়্যত করে সর্বপ্রথম ঘরে দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করবেন। এ নামাযের উভয় রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পাঠ করবেন। তারপর খালি পায়ে কবরস্থানে গিয়ে প্রথমে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآأَهْلَ الْقُبُوْرِ (আস্ সালামু আলায়কুম্ ইয়া-আহ্লাল ক্বুবূর) বলে কবরবাসীদেরকে সালাম করবেন। অতঃপর পশ্চিম দিকে পিঠ দিয়ে কবরের দিকে মুখ করে নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করবেন-

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآأَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَاِنَّا اِنْ شَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَة-

উচ্চারণ ঃ আস্সালা-মু আলায়কুম ইয়া- আহ্লাদ্ দিয়া-রি মিনাল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ওয়াল্ মুসলিমী-না ওয়াল্ মুসলিমা-তি ওয়া ইন্না- ইন্শা-আল্লা-হু বিকুম লা-হিক্বূ-ন। নাসআলুল্লা-হা লানা-ওয়া লাকুমুল আ-ফিয়াহ্।

অতঃপর ধারাবাহিকভাবে পাঠ করবেন : দরূদ শরীফ ৭ বার, সূরা ফাতিহা ৩ বার, চারকুল ৭ বার, সূরা তাকা-সুর ১ বার, সূরা যিলযা-ল ১ বার, আয়াতুল কুরসী ১ বার, পুনরায় দরূদ শরীফ ৭ বার। তারপর দু'হাত তুলে ঈসালে সাওয়াব করে মুনাজাত করবেন।

কবর তালক্বীন ও এর পরবর্তী দু'আ

দাফনের পর সবাইকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তালক্বীনকারী কবরের উপরিভাগে মৃতের বক্ষ বরাবর আঙ্গুল কিংবা লাঠির মাথা রেখে (মৃতের নাম ও তার মায়ের নাম ধরে يَافُلَانُ بْنَ فُلَانَةٍ মৃত মহিলা হলে يَافُلَانَةُ بِنْتَ فَلَانَةٍ ৩ বার সম্বোধন করবেন; তারপর) নিম্নলিখিত ইবারতটি বলতে বলতে তালক্বীন করবেন-

هٰذَا اَوَّلُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الْاٰخِرَةِ وَاٰخِرُ مَنْزِلِكَ مِنْ مَنَازِلِ الدُّنْيَا، هٰذَا دَارُ الْوَحْشَةِ هٰذَا دَارُ الْغُرْبَةِ وَهٰذا دَارُ الظُّلْمَةِ لَاتَخَفْ وَلَاتَحْزَنْ

اِذَا جَاءَكَ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ ازْرَقَانِ يَسْأَلَانِكَ عَنْ رَّبِّكَ وَعَنْ دِيْنِكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ فَقُلْ بِلِسَانٍ فَصِيْحٍ وَاِعْتِقَادٍ صَحِيْحٍ : أَشْهَدُ أَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَّرَسُوْلًا وَّبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا وَّبِالْكَعْبَةِ قِبْلَةً وَّبِالْمُؤْمِنِيْنَ اِخْوَانًا وَّبِحَلَالِ اللّٰهِ حِسَابًا وَّبِحَرَامِ اللّٰهِ عِقَابًا وَّاِنَّ السَّاعَةَ اٰتِيَةٌ لَارَيْبَ فِيْهَا، اِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِى الْقُبُوْرِ - اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ بِحَقِّ قَوْلِكَ الْقَدِيْمِ: يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ.

يَاعَبْدَ اللّٰهِ ! يَسْأَلَانِكَ عَنْ رَّبِّكَ قُلْ رَبِّىَ اللّٰهُ وَيَسْأَلَانِكَ عَنْ دِيْنِكَ قُلْ دِيْنِىَ الْاِسْلَامُ وَيَسْأَلَانِكَ عَنْ نَبِيِّكَ قُلْ نَبِيِّىْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَيَسْأَلَانِكَ وَمَاكُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ الَّذِىْ بُعِثَ فِيْكُمْ قُلْ بِاِعْتِقَادٍ صَحِيْحٍ هٰذَا نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰمَنْتُ بِنُبُوَّتِهِ وَرِسَالَتِهِ وَاتَّبَعْتُ بِكِتَابِهِ وَبِشَرِيْعَتِهِ، لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحٰبِهٖ أَجْمَعِيْنَ -

এর পরবর্তী দো'আ

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوْبَهُ وَاسْتُرْ عُيُوْبَهُ وَنَوِّرْقَبْرَهُ. اَللّٰهُمَّ نَقِّهِ مِنَ الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ. اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَطَايَاهُ كَمَا بَاعَدْتَّ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اَللّٰهُمَّ وَسِّعْ قَبْرَهُ وَاَدْخِلْهُ مُدْخَلًا كَرِيْمًا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَآءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ وَصَلَوَاتُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ وَسَلَامُهُ، يَآ أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ-

ইসক্বাত্ব

মৃতের দায়িত্বে নামায ও রোযা ইত্যাদি অনাদায়ী কিংবা ক্বসম ও যিহারের

কাফ্ফারা অপরিশোধিত থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাই, নিম্নলিখিত নিয়মে ইসক্বাত্ব করা গেলে মৃতকে আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন বলে আশা করা যায়। প্রথমে মৃতের জীবনে যত ওয়াক্বতের নামায, বিতরসহ দৈনিক ৬ ওয়াক্বত হিসেবে, যতটি ফরয রোযা ক্বাযা হয়েছে তা হিসাব করে প্রত্যেক নামায ও রোযার জন্য একেকটা ফিৎরার পরিমাণ গম অথবা এর সমপরিমাণ মূল্য হিসেবে সর্বমোট কত টাকা দাঁড়ায় তা নির্ণয় করতে হবে। তারপর শপথের কাফ্ফারা ও যিহারের কাফ্ফারা থাকলে আনুমানিক সংখ্যানুসারে তাও তদ্সঙ্গে যোগ করতে হবে। তারপর সামর্থ্য থাকলে ওই পরিমাণ অর্থ গরীব-মিসকীনকে দান করবেন। আর যদি সামর্থ্য না থাকে, তবে উক্ত বিরাট অংকের কাফ্ফারার নির্ণীত সংখ্যক অর্থ থেকে যথা সম্ভব টাকা হাতে নেবেন। তারপর নিজ খরচে একটা ক্বোরআন মজীদ ক্রয় করবেন। ওই ক্রয়কৃত ক্বোরআন মজীদ এবং কাফ্ফারা থেকে যথাসম্ভব সংগৃহীত টাকা (কমপক্ষে একদিনের নামাযের পূর্ণ কাফ্ফারার টাকা) হাতে নিয়ে তা সাদক্বাহ্ করার ঘোষণা দেবেন- 'ইসক্বাত্বের উদ্দেশ্যে প্রদেয় এ জিনিসগুলো নেওয়ার জন্য কেউ আছে কিনা। থাকলে তাকে এ জিনিসগুলো গ্রহণের জন্য আহ্বান করছি। যদি কেউ তা গ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে, তবে তাকে এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা প্রকাশ করে ওইগুলো তাকে হস্তান্তর করবেন। সে ওইগুলো নিয়ে সরে দাঁড়াবে এবং কিছুক্ষণ পর ওই জিনিসগুলো নিয়ে প্রদানকারীর সামনে আসবে। ওই প্রদানকারী তাকে বলবেন, ''আমিতো তোমাকে কতগুলো জিনিস দিয়েছিলাম। আমি যেহেতু আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সেহেতু ওই জিনিসগুলো আমাকে ফেরৎ দাও।'' তখন ওই গ্রহীতা বলবে, ''তা তো আমারও প্রয়োজন, আমিও তো এক গরীব লোক। তাই টাকা দিতে না পারলেও পবিত্র ক্বোরআন তিলাওয়াত করে তোমার মৃত ব্যক্তির রূহে ঈসালে সাওয়াব করবো এবং দো'আ করবো।'' অতপর, একটা দো'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে ইসক্বাত পর্ব সমাপ্ত করা হবে।

কতিপয় নফল নামাযের বিবরণ

তাহিয়্যাতুল ওযূ

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ওযূ করার পর দু'রাক্'আত নামায এমন নিষ্ঠাপূর্ণ উদ্দেশ্যে পড়বে যে, ওই গুলোর মধ্যে প্ররোচনা আসবে না, আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেবেন। (মুসলিম ও বুখারী)

তাহিয়্যাতুল ওযূ নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْوَضُوْءِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই সোয়ালা-তি তাহিয়্যাতিল ওয়াদ্বূ। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত তাহিয়্যাতুল ওযূর নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ؛ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক'আতাই সোয়ালা-তি তাহিয়্যাতিল মাসজিদি, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল্ কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থঃ আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ'র নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

☐ হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, ''যখন তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বসার পূর্বে দু'রাক্'আত নামায পড়ে নাও।''[বুখারী ও মুসলিম]

☐ এ দু'টি নামায মাকরূহ ও নিষিদ্ধ ওয়াক্বতে পড়বেন না। জুমু'আর মত অন্য যে কোন সময়েও ওযূ করে যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, তখনই এ দু'প্রকার নামায পড়ার চেষ্টা করবেন।

ইশ্রাক্বের নামায

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয় যে, ইশ্রাক্বের নামায সম্পন্নকারী এক হজ্ব ও এক উমরাহ্'র সাওয়াব লাভ করে। এ নামাযের পদ্ধতি হচ্ছে- ফজরের নামায পড়ে ওই জায়গায় বসে থাকবেন, যিক্র-আয্কার করতে থাকবেন, পার্থিব কোন কাজকর্ম করবেন না এবং কথাবার্তাও বলবেন না। যখন সূর্য পূর্ণাঙ্গভাবে বের হয়ে আসবে, তখন দু' রাক্'আত নফল নামাযের নিয়্যত সহকারে দু'কিংবা চার

রাক‘আত ইশ্‌রাক্বের নামায পড়বেন।

☐ মধ্যখানে দুনিয়াবী কাজকর্ম করলে সাওয়াব হ্রাস পায়।

☐ ইশ্‌রাক্বের সময় হয় যখন সূর্য পূর্ণাঙ্গভাবে বের হয়ে আসে। তখন সূর্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকানো যায় না। সূর্যোদয়ের অন্ততঃ পনের মিনিট পর সূর্যের এমন অবস্থায় হয়।

ইশ্‌রাক্বের নামাযের নিয়্যত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاِشْرَاقِ؛ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা‘আ-লা- রাক্‘আতাই সোয়ালা-তিল ইশ্‌রা-ক্ব্। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা’বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আল্লাহ্’র উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু’রাক্‘আত ইশ্‌রাক্বের নামায পড়ছি। আল্লাহু আকবার।

চাশ্‌তের নামায

এ নামায সম্পর্কে হাদীস শরীফে বহু ফযীলত এসেছে। এ নামায দারিদ্র দূরীকরণের জন্য পরীক্ষিত নোস্‌খা। কমপক্ষে ২ রাক্‘আত ও সর্বোচ্চ ১২ রাক্‘আত পর্যন্ত পড়া যায়। এ নামাযের মাধ্যমে ঘুম থেকে সুস্থভাবে জাগ্রত হবার পর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও গ্রন্থির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। একটি হাদীসে কুদ্‌সীতে আল্লাহ্ তা‘আলা এরশাদ করেন, ‘‘হে আদম সন্তান! তুমি দিনের প্রারম্ভিক অংশে আমার উদ্দেশ্যে চার রাক্‘আত নামায পড়ে নাও। ফলে আমি তোমার দিনের শেষাংশ পর্যন্ত তোমার জন্য যথেষ্ট থাকবো।’’ [তিরমিযী]

এ নামাযের সময় হচ্ছে, সূর্যে খুব প্রখরতা আসার পর থেকে শরীয়ত সম্মত অর্ধ দিবস আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত থাকে।

চাশ্‌তের নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الضُّحٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা‘আ-লা- রাক্‘আতাই সোয়ালা-তিদ্ব্ দ্বোহা- মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা’বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তা‘আলার উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু’রাক্‘আত চাশ্‌তের নামায সম্পন্ন করছি। আল্লাহু আকবার।

সালাতুল আওয়াবীন

এ নফল নামায মাগরিবের ফরয ও সুন্নাত আদায় করার পর পড়া হয়। হাদীসে

পাকে বর্ণিত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ নফলগুলো এভাবে পড়বে যে, সেগুলোর মধ্যভাগে কোন মন্দ কথা বলবে না, সে ১২ বছরের নফল নামাযের সমান সাওয়াব পাবে। এ নামায ২ রাক্‘আতের নিয়্যতে কমপক্ষে ৬ রাক্‘আত, সর্বোর্ধ ২০ রাক্‘আত পর্যন্ত পড়া যায় এবং প্রতি রাক্‘আতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার ‘সূরা ইখলাস্’ পড়া উত্তম।

আওয়াবীন নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَوَّابِيْنَ؛ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা‘আ-লা- রাক্‘আতাই সোয়ালা-তিল আউওয়া-বী-ন; মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা’বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্’র উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে ২ রাক্‘আত আউ্ওয়া-বীন নামায পড়ার নিয়্যত করছি। আল্লাহু আকবার।

তাহাজ্জুদের নামায

হাদীস শরীফে হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, রাতের ক্বিয়ামকে (তাহাজ্জুদ) অপরিহার্য করে নাও। কারণ, এটা ওই সব নেক বান্দাদের নিয়ম, যারা তোমাদের পূর্বে চলে গেছেন। এ নামায পড়লে বান্দা তার মহান রবের নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়। এ নামায গুনাহ্ থেকে বিরত রাখে, গুনাহ্ মোচন করে।[তিরমিযী] তাছাড়া, তখন বান্দার দো‘আ বিশেষভাবে কবূল হয়। এ নামাযের বদৌলতে মানুষ বড় বড় মর্যাদায় পৌঁছে যায়। তাহাজ্জুদের নামায অর্ধরাত অতিবাহিত হবার পর ঘুম থেকে জেগে ওঠে পড়তে হয়। কমপক্ষে ২ রাক্‘আত আর সর্বোর্ধ ১২ রাক্‘আত পর্যন্ত এ নামায পড়া যায়।

তাহাজ্জুদ নামাযের নিয়্যত ঃ

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّهَجُّدِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ
الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা‘আ-লা- রাক্‘আতাই সোয়ালা-তিত্ তাহাজ্জুদ; মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা’বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্’র উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে ২ রাক্‘আত তাহাজ্জুদের নামায সম্পন্ন করার নিয়্যত করলাম। আল্লাহু আকবার।

সালাতুত্ তাসবীহ্

এ নামাযেরও বহু ফযীলত রয়েছে। এ নামায পড়ার ফলে মানুষের নতুন-পুরাতন, সগীরা-কবীরাহ্, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, ইচ্ছাকৃত- অনিচ্ছাকৃতভাবে সম্পাদিত সমস্ত

গুনাহ্ আল্লাহ্ তা'আলা ক্ষমা করে দেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন চাচা হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এ নামায পড়ার শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর এরশাদ ফরমায়েছিলেন, ''সম্ভব হলে এ নামায প্রতিদিন, নতুবা প্রত্যেক জুমু'আহ্বার, অন্যথায় বছরে একবার, তাও সম্ভব না হলে জীবনে একবার অবশ্যই পড়বেন।'' এ নামায ৪ রাক্'আত। প্রত্যেক রাক্'আতে নিম্নলিখিত তাসবীহ্ নিম্নোক্ত নিয়মে প্রতি রাক্'আতে ৭৫ বার করে ৪ রাক্'আতে সর্বমোট ৩০০ বার পড়তে হয়-

سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়াল্হামদু লিল্লা-হি ওয়া লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার।

সালাতুত্ তাসবীহ্'র নিয়ম

৪ রাক্'আত সালাতুত্ তাসবীহ্ নামাযের নিয়্যত এভাবে করবেন-

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ صَلٰوةِ التَّسَابِيْحِ - سُنَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- আরবা'আ রাক'আ-তি সোয়ালা-তিত্ তাসা-বী-হ্; সুন্নাতু রসূলিল্লা-হি তা'আ-লা- মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্'র উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে ৪ রাক্'আত সালাতুত্ তাসবীহ্'র সুন্নাত নামায পড়ার নিয়্যত করলাম; আল্লাহু আকবার।

তাকবীর-ই তাহরীমার পর 'সানা' (সুবহানাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহাম্দিকা ওয়া তাবারাকাস্মুকা ওয়াতা'আলা জাদ্দুকা ওয়ালা-ইলা-হা গায়রুকা) পড়বেন। তারপর (সূরা ফাতিহা পড়ার আগে) ১৫ বার উপরোক্ত তাসবীহ (সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল্হাম্দু লিল্লা-হি ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার) পড়বেন। তারপর আ'ঊযুবিল্লাহ্, বিস্মিল্লাহ্, সূরা ফাতিহা ও কোন সূরা পড়ার পর (রুকূ'তে যাওয়ার পূর্বে) ১০বার ওই তাসবীহ্ পড়বেন। তারপর রুকূ' করবেন; রুকূ'তে সুবহা-না রব্বিয়াল্ 'আযীম ৩/৫/৭বার পড়ার পর ওই তাসবীহ ১০বার পড়বেন। তারপর রুকূ' থেকে 'সামি'আল্লা-হু লিমান্ হামিদাহ্' বলতে বলতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে 'রব্বানা- লাকাল হাম্দ' বলার পর ১০ বার ওই তাসবীহ পড়বেন। তারপর সাজদায় যাবেন সেখানেও সাজদার তাসবীহ পড়ার পর উপরোক্ত তাসবীহ্ ১০ বার পড়বেন। তারপর সাজদাহ্ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে নির্ধারিত দো'আ (আল্লাহুম্মাগ্ফির্লী ওয়ারহাম্নী ওয়াহ্দিনী ওয়ারযুক্বনী ওয়া'ফিনী) পড়ার পর বসে বসে ১০বার তাসবীহটি পড়বেন। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় গিয়ে একই নিয়মে সাজদার তাসবীহ পড়ার পর সাজদারত অবস্থায় ১০বার উক্ত তাসবীহ্ পড়বেন। এখন প্রথম রাক্'আত শেষ হল, তাসবীহ্ হল

সর্বমোট ৭৫ বার। তারপর দ্বিতীয় রাক্'আতে দাঁড়িয়ে (সূরা ফাতিহা পড়ার পূর্বে) প্রথমে ১৫ বার ওই তাসবীহ পড়বেন। তারপর প্রথম রাক্'আতের নিয়মে সূরা, ক্বিরআত এবং বাকী তাসবীহগুলো সহকারে আরো তিন রাক্'আত পড়বেন। এভাবে (প্রতি রাক্'আতে ৭৫ বার করে সর্বমোট ৩০০ বার ওই তাসবীহ পাঠ করার মাধ্যমে) চার রাক'আত পূর্ণ করবেন।[গুনিয়া ইত্যাদির বরাতে বাহারে শরীয়ত, ৪র্থ খণ্ড]

সালাতুল হাজাত

আবূ দাঊদ শরীফে হযরত হুযায়ফাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, যখন হুযূর আক্বদাস্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র সম্মুখে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এসে পড়তো তখন তজ্জন্য নামায পড়তেন- ২ রাক্'আত কিংবা ৪ রাক্'আত। হাদীস শরীফের বর্ণনানুসারে, প্রথম রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ৩ বার আয়াতুল কুর্সী এবং দ্বিতীয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর ১বার সূরা ইখলাস পড়বেন। এরপর আরো ২ রাক্'আত পড়লে উভয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহা পড়ার পর ৩য় ও ৪র্থ রাক্'আতে যথাক্রমে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস ১ বার করে পড়বেন। এ ৪রাক্'আত নামাযের সাওয়াব শবে ক্বদ্রের নামাযের সমান এবং এর ফলে হাজত বা চাহিদা পূরণ হয়। মাশাইখ হযরাতে কেরাম বলেছেন- এটা পরীক্ষিত।

নিয়্যত

نَوَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْحَاجَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সোয়ালা-তিল হা-জাহ্, মুতাওয়াজ্জিহান ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু'রাক্'আত সালাতুল হাজাত সম্পন্ন করার নিয়্যত করলাম। আল্লাহু আকবার।

সালাতুল আসরার বা নামাযে গাউসিয়া

চাহিদা পূরণের জন্য আরেকটি পরীক্ষিত নামায হচ্ছে সালাতুল্ আসরার বা নামাযে গাউসিয়া, যা ইমাম আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনে ইয়ূসুফ ইবনে জরীর লাখমী শাত্নূনী 'বাহ্জাতুল আসরার'-এ, মোল্লা আলী ক্বারী ও শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা হুযূর গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, এ নামায এভাবে পড়তে হয়- মাগরিবের ফরয নামাযের পর সুন্নাত নামায পড়ে এ দু'রাক্'আত নফল নামায পড়বেন। উত্তম হচ্ছে 'আল্হামদু' শরীফের পর প্রত্যেক রাক্'আতে ১১বার করে সূরা ইখ্লাস পাঠ করা। সালাম ফেরানোর পর হাম্দ ও সানা (আল্লাহর প্রশংসাসূচক বাক্য পাঠ করবেন) তারপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এর উপর ১১বার দরূদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার পর ১১বার

يَارَسُوْلَ اللّٰهِ يَانَبِيَّ اللّٰهِ اَغِثْنِىْ وَامْدُدْنِىْ فِىْ قَضَآءِ حَاجَتِىْ يَاقَاضِىَ الْحَاجَاتِ

(ইয়া রসূলাল্লাহ্! ইয়া নাবীয়্যাল্লাহ্! আগিস্‌নী ওয়াম্‌দুদনী ফী ক্বাদ্বা-ই হা-জাতী- ইয়া-ক্বা-দ্বিয়াল্ হা-জা-ত্) বলবেন। তারপর ইরাকের দিকে এগার ক্বদম এগিয়ে যাবেন এবং প্রতিটি ক্বদমে বলবেন-

يَاغَوْثَ الثَّقَلَيْنِ يَاكَرِيْمَ الطَّرَفَيْنِ اَغِثْنِىْ وَامْدُدْنِىْ فِىْ قَضَآءِ حَاجَتِىْ

(بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ)

(ইয়া- গাউসাস্ সাক্বালাঈন, ইয়া- কারী-মাত্ ত্বোয়ার্‌ফাঈন, আগিস্‌নী- ওয়াম্‌দুদ্‌নী- ফী- ক্বাদ্বা-ই হা-জা-তি [বিতাওফী- ক্বিল্লা-হি আয্‌যা ওয়া জাল্লা]) তারপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা নিয়ে দো'আ করবেন।

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الْاَسْرَارِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সোয়ালা-তিল আস্‌রা-র, মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লা-হু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্ তা'আলার উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু'রাক্'আত সালাতুল আসরার সম্পন্ন করার নিয়্যত করলাম। আল্লাহু আকবার।

তাওবার নামায

আবূ দাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও ইবনে হাব্বান তাঁদের 'সহীহ'-এ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, হুযূর এরশাদ ফরমায়েছেন, ''যখন কোন বান্দা গুনাহ্ করে তারপর ওযূ করে নামায পড়ে, তারপর ইস্তিগফার অর্থাৎ গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ্ তা'আলা তার গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন।'' এটাও নফল নামায।

সালাতুত্ তাওবাহ্'র নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ التَّوْبَةِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সোয়ালা-তিত্ তাওবাহ্। মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার।

অর্থ ঃ আমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ক্বেবলামুখী হয়ে দু' রাক্'আত সালাতুত্ তাওবাহ্ সম্পন্ন করার নিয়্যত করলাম। আল্লাহু আকবার।

তারপর উভয় রাক্'আতে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা পড়ে নামায সম্পন্ন করবেন।

নামায-ই সফর

কোথাও সফরে যাওয়ার সময় নিজ ঘরে অথবা নিজের অবস্থানের জায়গায় দু' রাক্'আত নফল নামায পড়ে নেবেন। তাবরানী শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, যে কেউ সফরের সময় দু'রাক্'আত নামায পড়েছে সে তদপেক্ষা উত্তম কিছু তার পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে যায় নি।

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ السَّفَرِ- مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সোয়ালা-তিস্ সাফারি্ মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার।

সফর থেকে ফিরে এসে যে নামায পড়বেন

সফর থেকে ফিরে এসে মহল্লার মসজিদে দু'রাক্'আত নফল নামায পড়া অতি সাওয়াবদায়ক। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত কা'ব ইবনে মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে দিনে চাশ্‌তের সময় তাশরীফ আনতেন। তখন প্রথমে মসজিদে তাশরীফ নিয়ে যেতেন এবং দু' রাক্'আত নামায পড়তেন। তারপর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। অতঃপর আপন হুজূরা শরীফে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

নিয়্যত

نَوَيْتُ اَنْ اُصَلِّىَ لِلّٰهِ تَعَالٰى رَكْعَتَىْ صَلٰوةِ الرُّجُوْعِ مِنَ السَّفَرِ مُتَوَجِّهًا اِلٰى جِهَةِ الْكَعْبَةِ الشَّرِيْفَةِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

উচ্চারণ ঃ নাওয়াইতু আন্ উসোয়াল্লিয়া লিল্লা-হি তা'আ-লা- রাক্'আতাই সোয়ালা-তির্ রুজূ-'ই মিনাস্ সাফারি; মুতাওয়াজ্জিহান্ ইলা- জিহাতিল কা'বাতিশ্ শারী-ফাতি আল্লাহু আকবার।

☐ শরীয়তে ওই ব্যক্তি মুসাফির, যে তিন দিনের পথ পর্যন্ত গমনের উদ্দেশ্যে এলাকা থেকে বের হয়। এ দূরত্বের পরিমাণ হচ্ছে সাড়ে সাতান্ন মাইল।

[ফাতাওয়া-ই রেযভিয়ার বরাতে 'বাহারে শরীয়ত']

☐ কমপক্ষে তিন দিন লাগাতার সফরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে কোথাও পনের দিন অবস্থানের নিয়্যত না করলে সে পুনরায় নিজ লোকালয় (ওয়াত্বনে আস্‌লী) কিংবা ইক্বামতের স্থানে (ওয়াত্বনে ইক্বামত) না পৌঁছা পর্যন্ত মুসাফির থাকবে।

◻ গন্তব্য স্থানে পৌঁছার পর কেউ যদি সেখানে ১৫ দিন বা ততোধিক সময় অবস্থানের নিয়্যত না করে অবস্থান করতে থাকে তাহলে ততদিন পর্যন্ত সে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। এমনকি সে কোথাও পৌঁছে সেখানে কতদিন থাকবে তার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিতে না পারলে অবস্থানের নিয়্যত না করে শুধু পনের দিন নয়, বরং মাসের পর মাস থাকলেও সে মুক্বীম হবে না; বরং মুসাফিরই থাকবে। এ কারণে, সামুদ্রিক জাহাজ, রেলগাড়ি, স্টিমার, লঞ্চ ও বিমানে কর্মরত ও অবস্থানকারীরা গোটা সফরেই মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। তারা নামাযে ক্বসর করবে। কারণ, এসব যানবাহনে কোথাও পনের দিন অবস্থানের নিয়্যত করার ও অবস্থানের সুযোগ থাকেনা।

◻ যাত্রার পর তখন থেকে কেউ মুসাফির বলে গণ্য হবে যখন সে নিজ লোকালয়ের বাইরে চলে যাবে। লোকালয় শহর হলে শহরের বাইরে চলে যাওয়া এবং গ্রাম হলে গ্রাম হতে বের হয়ে যাওয়ার পর থেকে তার সফর আরম্ভ হবে। উল্লেখ্য, যে দিক থেকে বের হয় সেদিকের লোকালয়ের শেষ প্রান্তই এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। [দুররে মুখতার, গুনিয়া, বাহারে শরীয়ত]

◻ মুসাফির তার সফরকালে একাকী কিংবা ইমাম হিসেবে ফরয নামায আদায় করলে চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযগুলোকে ক্বসর করবে। অর্থাৎ, যোহর, আসর ও এশার ফরয চার রাক্'আতের স্থলে দু'রাক্'আত পড়বে।

◻ ইমাম মুসাফির হলে, মুসাফির-মুক্বতাদীও ইমামের সাথে ক্বসর পড়বে। আর তখন তাঁর মুক্বতাদী মুক্বীম থাকলে, ইমাম দু'রাক্'আত পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিলে সে বাকি দু'রাক্'আত পড়ে নেবে। এ দুই রাক্'আতে সে ক্বির্আত মোটেই পড়বে না; বরং সূরা ফাতিহা পরিমাণ সময় দাঁড়াবে। [দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত]

◻ মুসাফিরের জন্য নামাযে ক্বসর পড়া ওয়াজিব। অর্থাৎ চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয দু'রাক্'আত পড়বে। তার ক্ষেত্রে দু'রাক্'আতই পূর্ণ নামায। ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাক্'আত পড়লে গুনাহ্গার ও আযাবের উপযোগী হবে। চার রাক্'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযগুলো ব্যতীত অন্যান্য নামাযে ক্বসর নেই; বরং পুরোপুরি পড়তে হবে। [হেদায়া, আলমগীরী, দুররে মুখতার, বাহারে শরীয়ত]

ইস্তিখারার নামায

যখন কেউ কোন কাজ করার ইচ্ছা করে তখন তার ইস্তিখারাহ্ করা চাই। এটা যেন আল্লাহর সাথে শলা-পরামর্শ করা। হাদীস শরীফে এর প্রতি তাকীদ দেওয়া হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমায়েছেন, ইস্তিখারাহ্ না করা দুর্ভাগ্য ও হতভাগ্যের পরিচয়। সুতরাং কোথাও বিয়ে-শাদী, বাগদান কিংবা সফরে যাবার ইচ্ছা করলে প্রথমে ইস্তিখারাহ্ করা চাই। ইন্শাআল্লাহ্ ফলাফল ভাল হবে। ইস্তিখারাহ্র নামাযের নিয়ম হচ্ছে- প্রথমে দু'রাক্'আত নফল নামায পড়বেন। নামাযের পর এ দো'আ খুব আন্তরিকতার সাথে পড়বেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکَ وَاَسْتَقْدِرُکَ بِقُدْرَتِکَ وَاَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ ـ فَاِنَّکَ تَقْدِرُ وَلَآ اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَآ اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ـ اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدُرْهُ لِیْ وَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِکْ لِیْ فِیْهِ ـ وَاِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَاقْدُرْلِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثُمَّ اَرْضِنِیْ بِهٖ ـ

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হুম্মা ইন্নী- আস্তাখী-রুকা বি'ইল্মিকা ওয়া আস্তাক্বদিরু বিক্বুদ্রাতিকা ওয়া আস্আলুকা মিন্ ফাদ্বলিকাল 'আযী-ম। ফাইন্নাকা তাক্বদিরু ওয়ালা-আক্বদিরু ওয়া তা'লামু ওয়ালা-আ'লামু। ওয়া আন্তা আল্লামুল গুয়ূ-ব। আল্লা-হুম্মা ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল আম্রা খায়রুল্লী- ফী- দী-নী- ওয়া মা'আ-শী ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আম্রী- ফাক্বদুরহু লী ওয়া ইয়াস্সিরহু লী- সুম্মা বারিক্লী- ফী-হি। ওয়া ইন্ কুন্তা তা'লামু আন্না হা-যাল্ আমরা শার্রুল্ লী- ফী-দ্বী-নী ওয়া মা'আ-শী- ওয়া 'আ-ক্বিবাতি আম্রী- ফাস্রিফহু 'আন্নী- ওয়াস্রিফ্নী 'আনহু ওয়াক্বদুর্লিয়াল্ খায়রা হায়সু কা-না সুম্মারদ্বা বিহী-।

উল্লেখ্য, 'হা-যাল্ আম্রা' পর্যন্ত পৌঁছেই আপনার কাঙ্খিত কাজটার ধ্যান করবেন। তারপর পাক-সাফ বিছানায় ক্বেবলার দিকে মুখ করে ওযূ সহকারে শুবেন। যদি স্বপ্নে সাদা কিংবা সবুজ রঙ দেখা যায়, তবে ওই কাজটি করবেন। ইন্শা আল্লাহ্ তা মঙ্গলময় হবে। আর লাল কিংবা কালো রঙ দেখা গেলে ওই কাজটি বর্জন করাই উত্তম হবে।[শামী] আর যদি কিছুই দেখা না যায়, তবে শয়ন থেকে ওঠার পর যে কথাটা মনে দৃঢ়ভাবে আসবে তাই করবেন। তা-ই মঙ্গলময় হবে।

সূর্য গ্রহণ (কুসূফ)এর নামায

এ নামায সুন্নাত। সূর্যগ্রহণ শুরু হলে দু'রাক্'আত বা চার রাক্'আত (দু'দু' রাক্'আত কিংবা এক নিয়্যতে চার রাক্'আত) নামায পড়া হয়। আযান, ইক্বামত ও খোত্বা ব্যতীত জুমু'আহ্র ইমাম জুমু'আহ্র অন্যান্য শর্তাবলী পাওয়া গেলে জামা'আত সহকারে এ নামায পড়াবেন। অন্যথায়, মসজিদে বা ঘরে প্রত্যেকে একাকী পড়বেন।

জামা'আত সহকারে পড়লে ইমাম ক্বির্আত, ইমাম আ'যম রহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে, নীরবে পড়বে। অবশ্য সাহেবাঈন উচ্চরবে পড়ার পক্ষেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এ নামাযের ক্বিরআতকে দীর্ঘায়িত করা হবে। আর যতক্ষণ 'গ্রহণ' থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাসবীহ্, তিলাওয়াত ও যিক্র-আযকারে রত থাকবেন। সুন্নাতের নিয়্যতে সালাতুল কুসূফের নামায আদায় করতে হয়।

চন্দ্রগ্রহণ (খুসূফ)এর নামায

এ নামায মুস্তাহাব (সুন্নাতে যা-ইদাহ্)। চন্দ্রগ্রহণের নামাযে জামা'আত নেই- ইমাম মওজুদ থাকুন কিংবা নাই থাকুন উভয় অবস্থাতেই এ নামায একাকী পড়া হবে। [দুররে মুখতার, হেদায়া, আলমগীরী ও ফাতহুল কৃদীর-এর বরাতে কানূনে শরীয়ত]

অবশ্যই বাহারে শরীয়তে ইমাম ব্যতীত দুই/তিন জন মিলে এ নামায জামা'আত সহকারেও পড়া যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ☐ দিনের বেলায় ভয়ানক অন্ধকার, প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া এবং অতিমাত্রায় পেরেশানী ও ভয়ের সময় দু'রাক্'আত নামায পড়া মুস্তাহাব।[আলমগীরী ও দুররে মুখতার ইত্যাদি]

ইস্তিসক্বার নামায

অনাবৃষ্টি দেখা দিলে বৃষ্টির জন্য যে নামায পড়া হয়, তা ইস্তিসক্বার নামায। ইস্তিসক্বার নামায জামা'আত বিহীনই হয়; অর্থাৎ একাকী পড়াও জায়েয। এ সমস্যার সমাধানের জন্য শুধু দো'আ এবং ইস্তিগফার করা হয়। এটাই ইমাম আ'যমের অভিমত। সাহেবাঈন (ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রহিমাহুমুল্লাহ্)'র মতে, ইমাম সরবে ক্বিরআত সহকারে দু'রাক্'আত নামায পড়াবেন। অতঃপর খোৎবা দেবেন এবং ক্বেবলামুখী হয়ে দো'আ করবেন। ইমাম আপন চাদরকে উল্টিয়ে পরবেন। মুক্বতাদীরা চাদর উল্টাবে না। [ক্বদূরী]

ইমাম ক্বেবলার দিকে ফিরে স্বীয় দু'হাত উপরে উঠিয়ে দাঁড়াবেন এবং উপস্থিত সকলে ক্বেবলার দিকে মুখ করে বসে থাকবেন আর ইমামের দো'আয় 'আ-মীন' বলবেন। দো'আ নিম্নরূপ;

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا هَنِيْئًا مَّرِيْئًا مُّرِيْعًاغَدَقًا مُجَلِّلا سَحًّا طَبَقًا دَآئِمًا

এ জাতীয় দো'আ অনুচ্চ বা উচ্চ আওয়ায সহকারে উভয়ভাবে পড়া যাবে।

— ০ —

দুরূদ-ই তাজ

[তাৎপর্য ও ফযীলত]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ التَّاجِ وَالْمِعْرَاجِ وَالْبُرَاقِ وَالْعَلَمِ ـ دَافِعِ الْبَلَآءِ وَالْوَبَآءِ وَالْقَحْطِ وَالْمَرَضِ وَالْاَلَمِ ـ اِسْمُهٗ مَكْتُوْبٌ مَّرْفُوْعٌ مَّشْفُوْعٌ مَّنْقُوْشٌ فِى اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ ـ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ ـ جِسْمُهٗ مُقَدَّسٌ مُّعَطَّرٌ مُّطَهَّرٌ مُّنَوَّرٌ فِى الْبَيْتِ وَالْحَرَمِ ـ شَمْسِ الضُّحٰى بَدْرِ الدُّجٰى صَدْرِ الْعُلٰى نُوْرِ الْهُدٰى كَهْفِ الْوَرٰى مِصْبَاحِ الظُّلَمِ ـ جَمِيْلِ الشِّيَمِ ـ شَفِيْعِ الْاُمَمِ ـ صَاحِبِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ ـ وَاللّٰهُ عَاصِمُهٗ وَجِبْرِيْلُ خَادِمُهٗ وَالْبُرَاقُ مَرْكَبُهٗ وَالْمِعْرَاجُ سَفَرُهٗ وَسِدْرَةُ الْمُنْتَهٰى مَقَامُهٗ وَقَابَ قَوْسَيْنِ مَطْلُوْبُهٗ وَالْمَطْلُوْبُ مَقْصُوْدُهٗ وَالْمَقْصُوْدُ مَوْجُوْدُهٗ ـ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ خَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ شَفِيْعِ الْمُذْنِبِيْنَ اَنِيْسِ الْغَرِيْبِيْنَ رَحْمَةٍ لِّلْعٰلَمِيْنَ رَاحَةِ الْعَاشِقِيْنَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِيْنَ شَمْسِ الْعَارِفِيْنَ سِرَاجِ السَّالِكِيْنَ مِصْبَاحِ الْمُقَرَّبِيْنَ ـ مُحِبِّ الْفُقَرَآءِ وَالْغُرَبَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ سَيِّدِ الثَّقَلَيْنِ نَبِيِّ الْحَرَمَيْنِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ اَبِى الْقَاسِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ نُوْرٌ مِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ـ يَآاَيُّهَا الْمُشْتَاقُوْنَ بِنُوْرِ جَمَالِهٖ صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

বঙ্গানুবাদ ঃ আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। হে আল্লাহ্! আমাদের আক্বা ও মাওলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর সালাত নাযিল করুন, যিনি তাজ, মি'রাজ, বোরাক্ব ও ঝাণ্ডা (লিওয়া-ই হাম্দ)-এর ধারক, যিনি (আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতায়) বালা-মুসীবত, মহামারী, দূর্ভিক্ষ, রোগ ও দুঃখ-কষ্ট অপসারণকারী। তাঁর নাম মুবারক লিখিত, উন্নত, (আল্লাহর নামের সাথে) সংযোজিত এবং লাওহ্ ও ক্বলমে খোদিত। তিনি আরব ও অনারবের সরদার। তাঁর শরীর মুবারক অতি পবিত্র, সুবাসিত, পাক-পরিচ্ছন্ন এবং

তিনি খানায়ে কা'বা ও হেরমে পাকের মধ্যে আলোকিত, তিনি মধ্যাহ্ন সূর্য, আঁধার রাতের চাঁদনী, উন্নত মর্যাদার শীর্ষে সমাসীন, হিদায়তের পথের আলো, সৃষ্টিজগতের আশ্রয়স্থল, অন্ধকার রাতের প্রদীপ। তিনি সুন্দরতম আচরণের ধারক, উম্মতের সুপারিশকারী। দান ও বদান্যতায় গুণান্বিত। আল্লাহ্ তাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারী, জিব্রাঈল আলায়হিস্ সালাম তাঁর খাদিম, বোরাক্ব তাঁর বাহন, মি'রাজ তাঁর সফর, সিদরাতুল মুন্তাহা তাঁর 'মক্বাম' ও (আল্লাহর নৈকট্যের ক্ষেত্রে) 'ক্বাবা ক্বাউসাঈন' (মিলিত দু'ধনুকের সান্নিধ্যের মত)'র মর্যাদা তাঁর কাঙ্খিত উদ্দেশ্য। এ কাঙ্খিত বস্তু তাঁর কাম্য এবং এ কাম্য বস্তুই তাঁর অর্জিত। তিনি রসূলকুল সরদার, সর্বশেষ নবী, পাপীদের সুপারিশকারী, মুসাফিরদের প্রতি সহানুভূতিশীল, বিশ্ববাসীর জন্য রহমত, আশেক্বদের শান্তি, অনুরাগীদের উদ্দেশ্যস্থল, খোদাপরিচিতি সম্পন্নদের সূর্য, খোদার রাহের পথিকদের আলোকবর্তিকা, আল্লাহর নৈকট্যধন্যদের রাহনুমা; অভাবী, মুসাফির ও মিসকীনদের প্রতি স্নেহশীল। তিনি জিন ও ইনসানের সরদার, দু'হেরমের নবী, উভয় ক্বিবলার পেশওয়া, দুনিয়া ও আখিরাতে আমাদের ওসীলা, ক্বা'বা ক্বাউসাঈনের মহামর্যাদায় আসীন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের রবের প্রিয়, হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন (রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা)'র মহান নানাজান, আমাদের ওই (সমস্ত) জিন ও ইনসানের আক্বা অর্থাৎ হযরত আবুল ক্বাসিম মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ্, যিনি আল্লাহর নূর। হে নূরে মুহাম্মদীর সৌন্দর্যের অনুরাগীরা! তোমরা তাঁর উপর এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের প্রতি দুরূদ ও সালাম প্রেরণ করো- যেভাবে প্রেরণ করা শোভা পায়।

তাৎপর্য ও ফযীলত

যে কোন দুরূদ শরীফই তো অতি বরকতময়। পবিত্র ক্বোর্আন মজীদে আল্লাহ্ পাক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র উপর সালাত (দরূদ শরীফ) ও সালাম পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস শরীফে খোদ্ নবী আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, ''যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ্ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন, তার দশটি গুনাহ্ ক্ষমা করেন এবং দশটি দরজাহ্ (মর্যাদার স্তর) বুলন্দ করেন।'' দুরূদ শরীফ পাঠ করা এমন এক ইবাদত, যা আল্লাহর দরবারে নিঃসন্দেহে কবূল হয়। হাদীস শরীফে বহু ধরনের দুরূদ শরীফ বর্ণিত হয়েছে। তা'ছাড়া পবিত্র ক্বোর্আন্ ও হাদীসের আলোকে হযরাত ওলামা-ই কেরাম ও বুযর্গান-ই দ্বীন বিভিন্ন প্রকার আরবী সাহিত্য-শিল্পসমৃদ্ধ ইবারতে দুরূদ শরীফ রচনা করে আল্লাহ্ ও রসূলের প্রিয়ভাজন হয়েছেন। খাজা-ই খাজেগান হযরত খাজা আবদুর রহমান চৌহর্ভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান দ্বারা ত্রিশপারা সম্বলিত বিশ্বের অনন্য এবং গ্রহণযোগ্য ও বরকতময় দুরূদ শরীফের অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'মাজমু'আহ্-ই সালাওয়াতির্ রসূল' রচনা করে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন।

'দরূদ-ই তাজ'ও বিশ্ববিখ্যাত ওলী ও ইমাম আল্লামা শাযলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র রচিত এক মহা বরকতময় 'দরূদ শরীফ'। এতে তিনি যে চমৎকার বর্ণনা ভঙ্গিতে বিশ্বকুল সরদার সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা করেছেন তার দৃষ্টান্ত বিরল।

হযরত মাওলানা ক্বারী সুলায়মান পাহ্লোয়ারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর লিখিত কিতাব 'সালাত ও সালাম'-এ লিখেছেন যে, হযরত শায়খ সৈয়দ আবুল হাসান শাযলী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'দুরূদে তাজ শরীফ' রচনা করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র রওযা-ই পাকে পেশ করে আরয করলেন, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! এ দুরূদ শরীফের অনুকূলে এ মঞ্জুরী দান করুন যেন এটা ঈসালে সাওয়াবের সময় খতম শরীফের মধ্যে পাঠ করা যায়।'' হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তা মঞ্জুর করলেন। এ দুরূদ শরীফের এ এক মহান ফযীলত। অন্যান্য ফযীলত তো আছেই। 'খতমে গাউসিয়া শরীফ'-র সাথে দুরূদ-ই তাজ শরীফের সংযোজন ও পঠন যে কতোই তাৎপর্যবহ তা এ বর্ণনা থেকেই প্রতিভাত হয়।

রচয়িতার অসাধারণ ইশ্ক্বে রসূল

আল্লামা আবদুল ওহাব শা'রানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'মীযান আল্-কুবরা'-এর ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- ''হযরত ইমাম আবুল হাসান শাযলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এক আরিফ বিল্লাহ্, আশেক্বে রসূল, সাহেবে হুযূরী এবং অসামান্য উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ওলী-ই কামিল ছিলেন। শুধু তিনি নিজেই নন, বরং তাঁর শাগরিদ আবুল আব্বাস মায়াসী প্রমুখ (আলায়হিমুর্ রাহমাহ্) বলেছেন, ''যদি আমরা চোখের পলক মারার পরিমাণ সময়ের জন্যও রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দীদার ও যিয়ারত থেকে অন্তরালে হয়ে যাই, তবে নিজেদেরকে মুসলমানদের মধ্যে গণ্য করতেও দ্বিধা বোধ করি।'' (সুবহানাল্লাহ্!)

দরূদ-ই তাজ শরীফের কতিপয় পরীক্ষিত উপকারিতা

ওলামা-ই কেরাম দুরূদ-ই তাজ শরীফের বহু ফযীলত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটা বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরীক্ষিত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়-

- চান্দ্রমাসের প্রথম জুমু'আর রাত থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী আরো এগার রাত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে পবিত্র জামা-কাপড় পরে খুশবু লাগিয়ে ক্বেবলামুখী হয়ে ১৭০ বার এ পবিত্র ও বরকতময় দুরূদ শরীফ পাঠ করে শয়ন করলে ইন্শা আল্লাহ্ হুযূর সরওয়ারে কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র যিয়ারত লাভ করে ধন্য হওয়া যায়।
- ক্বল্বের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভের জন্য প্রতি দিন ফজর নামাযের পর ৭ বার, আসর নামাযের পর ৩ বার এবং এশার নামাযের পর ৩ বার পাঠ করা যায়।
- এ দুরূদ শরীফ যাদু-টোনা ও জিন-শয়তানদের প্রভাব থেকেও মুক্ত রাখে।
- এ দুরূদ শরীফ ১১ বার পাঠ করে ফুঁক দিলে মহামারী ও বসন্ত রোগগ্রস্ত

বিশেষ উপকৃত হয়।

🗗প্রত্যেক দিন ফজর নামাযের পর নিয়মিতভাবে এ দরুদ শরীফ পাঠ করলে রিযক্ব প্রশস্ত হয়।

🗗২১টি খোরমার প্রত্যেকটিতে ৭ বার করে পাঠ করে ফুঁক দিয়ে প্রতিদিন একটি বন্ধ্যা স্ত্রীলোককে খাওয়ালে অতঃপর স্ত্রী হায়য/মাসিক ঋতুস্রাব থেকে পবিত্রতা অর্জন ও গোসল করার পর সহবাস করলে আল্লাহর অনুগ্রহে নেক্কার সন্তান জন্মলাভ করবে।

🗗গর্ভবতী মহিলার গর্ভজনিত কোন অসুবিধা দেখা দিলে ৭দিন যাবৎ ৭বার করে লাগাতার পানির উপর ফুঁক দিয়ে তা পান করানো হলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

🗗পারস্পরিক শরীয়তসম্মত বন্ধুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে অর্ধরাতের পর ওযূ সহকারে খালেস অন্তঃকরণে চল্লিশবার এ দুরূদ শরীফ পাঠ করলে ভাল উদ্দেশ্য হাসিল হবার বিশেষ আশা করা যায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে শর্ত হল গুনাহর নিয়্যত থাকতে পারবে না।

বস্তুতঃ দরূদ-ই তাজ শরীফ হচ্ছে মহানবী সরওয়ারে কা-ইনাত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'রই পবিত্র ক্বোর্আন, সুন্নাহ, ইজমা' ও ক্বিয়াস সমর্থিত অতীব উন্নতমানের প্রশংসাসম্ভার, যা এ মহান দুরূদ শরীফের অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠবে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

যিয়ারতের মাসাইল

মহান রব্বুল আলামীনের অমোঘ বিধানানুযায়ী প্রত্যেক জীবকে মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। এ মর্মে পবিত্র ক্বোর্আনে এরশাদ হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ। মৃত্যু এমন এক সত্য যাকে আস্তিক-নাস্তিক কেউ অস্বীকার করে না। জীবন সম্পর্কে মানুষের ধ্যান-ধারণা যাই হোক, মৃত্যু নিয়ে কেউ বাড়াবাড়ি করে না। জীবন-মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা মানুষকে উভয়জগতে ধন্য করবে নিঃসন্দেহে। জীবন-মৃত্যুর সৃষ্টির উদ্দেশ্য আল্লাহ্ তা'আলার ভাষায় اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ মৃত্যু এবং জীবন সৃষ্টি করেছেন, যাতে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সবচেয়ে পুণ্যবান।) [সূরা মুল্ক, আয়াত ২]

কাফির-মুশরিক তথা অমুসলিমদের জন্য মৃত্যু অতি ভয়াবহ। কিন্তু ঈমানদারদের জন্য তা বিশ্রাম ও উপহার স্বরূপ। কারণ, একজন ঈমানদার মুসলমান গুনাহগার হলেও মৃত্যুর পর তার জন্য মুক্তির পথ রয়েছে। আর তন্মধ্যে অন্যতম হল জীবিত সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন ও সর্বসাধারণ মুসলমানদের দো'আ। কবর যিয়ারত এ দো'আরই শরীয়ত সম্মত একটি পদ্ধতি। নিম্নে যিয়ারত সম্পর্কিত প্রয়োজনীয়

বিষয়াবলী আলোচনা করা হচ্ছে।

যিয়ারতের ভিত্তি

জীবিত মুসলমানগণ ওফাতপ্রাপ্ত মুসলমানদের জন্য পরম ক্ষমাশীল মহান আল্লাহর দরবারে কিভাবে মাগফিরাত কামনা করবে, তা শিক্ষা দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ এরশাদ করেন-

رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَؤُفٌ رَّحِيْمٌ ۝

অর্থাৎ ''হে আমাদের পরওয়ারদিগার! আমাদের ক্ষমা কর এবং আমাদের ওই ভাইদেরকেও, যারা ঈমান সহকারে আমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। আর আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে কোন হিংসা রেখো না। নিশ্চয়ই তুমি অতীব দয়ার্দ্র, অত্যন্ত দয়ালু।''

আলোচ্য আয়াত মৃত ব্যক্তিদের জন্য ফাতিহা, ঈসালে সাওয়াব ও যিয়ারত ইত্যাদির ভিত্তি স্বরূপ। এসব দ্বারা সমস্ত মৃতব্যক্তি যে পরকালে উপকৃত হবে তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে, অসংখ্য বিশুদ্ধ হাদীস শরীফও যিয়ারতের ভিত্তি হিসেবে পাওয়া যায়।

কতিপয় হাদীস শরীফ

◻ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন,

---

লেখক: আলহাজ্ব মাওলানা কাজী মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন আশরাফী

''আমি আল্লাহ্র নিকট আমার আম্মাজানের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এর অনুমতি প্রদান করলেন। অতঃপর তোমরা কবরসমূহের যিয়ারত কর। কারণ, কবর যিয়ারত তোমাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।''

বিঃদ্রঃ মদীনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফের পথে ২০৮ কিলোমিটার দূরে 'মাস্তুরা' নামক স্থান। ওখান থেকে মদীনা শরীফের দিকে ৪ কিলোমিটার এসে ৩০ কিলোমিটার ব্যাপী মরুপ্রান্তর হল 'আবওয়া' নামক স্থান। পিত্রালয় থেকে আসার পথে এ স্থানে হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গুরুতর অসুস্থ হয়ে ইন্তিকাল করেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র বয়স মাত্র ৫/৬ বছর। মায়ের মৃত্যুকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর শিরপ্রান্তে বসা ছিলেন। এখানে শানদার গুম্বজ এবং তৎসংলগ্ন মসজিদ ছিল। নজদী ওহাবীরা মাযার ও মসজিদ উভয়ই ভেঙ্গে দিল। অতঃপর মক্কাবাসীরা পুনঃনির্মাণ করল। নজদীরা তাও পুনরায় ভেঙ্গে দিল এবং কবর শরীফও উপড়ে ফেলেছে বলে জানা গেছে। বর্তমানে কবর শরীফের চার পাশে পাথরের ঘেরা আছে।

['সফরনামা' ২য় খন্ড, ৫৪ ও ৫৫ পৃষ্ঠা, কৃতঃ হাকীমুল উম্মত মুফাস্সিরে ক্বোর্আন আল্লামা মুফ্তী

আহমদ ইয়ার খান্ নঈমী আশরাফী রহমাতুল্লাহি আলায়হি]

□ হযরত ইবনে বুরায়দাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় পিতা হযরত বুরায়দাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করতাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর।'' [মুসলিম শরীফ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৪]

যিয়ারতের ফযীলত

□হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''আমার উম্মতের উপর আল্লাহ্ তা'আলার অসীম দয়া হচ্ছে, যে ব্যক্তি গুনাহ্গার অবস্থায় কবরে প্রবেশ করেছে সে মুসলমানদের দো'আ ও ইস্তিগফার দ্বারা নিষ্পাপ হয়ে উঠবে (কবর থেকে)।''

[তাবরানী আজমাত, আক্বায়েদে ইসলাম ও রওযাতুল হুযূর ইত্যাদি]

□ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি কবরস্থানে এসে 'সূরা ইয়াসীন' তিলাওয়াত করবে, আল্লাহ্ তা'আলা এর বরকতে কবরবাসীদের আযাব হ্রাস করে দেবেন এবং তিলাওয়াতকারী কবরস্থানের মৃতদের সংখ্যা পরিমাণ সাওয়াব লাভ করবে।''[শরহুস্ সুদূর, কৃত. ইমাম সুয়ূতী]

□অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, ''যে ব্যক্তি কবরস্থান অতিক্রমকালে ১১বার 'সূরা ইখলাস' তিলাওয়াত করে এর সাওয়াব মৃতদের দান করবে ওই ব্যক্তি উক্ত কবরস্থানে দাফনকৃত মৃতদের সংখ্যা পরিমাণ সাওয়াব পাবে। হতে পারে এ সাওয়াব তিলাওয়াতের সাওয়াবেরও অতিরিক্ত। অন্যথায় ১১বার সূরা ইখলাস তিলাওয়াতে ৩বার খতমে কোরআনের চেয়েও বেশী সাওয়াব হবেই। অথবা মৃত ব্যক্তির সংখ্যা বলতে আধিক্য বুঝানো হয়েছে। [শরহুস্ সুদূর বিআহ্ওয়ালিল্ মাওতা ওয়াল কুবূর]

□অপর হাদীসে বর্ণিত আছে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'আলা জীবিতদের দো'আ মৃতদের কবরে পাহাড়ের ন্যায় বড় করে পাঠান এবং জীবিতদের দো'আ মৃতদের জন্য উপহার স্বরূপ।[আক্বাইদে ইসলাম]

যিয়ারতকারীর উপর কবরবাসী সন্তুষ্ট হয়, যেমনিভাবে ইহজগতে মানুষ আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ হতে হাদিয়া-তোহ্ফা, উপহার- উপঢৌকন পেলে আনন্দিত হয়, অনুরূপ কবরজগতেও। অতঃপর কবরবাসীর মর্যাদানুসারে যিয়ারতকারী বরকতও লাভ করবে।[কুল্লিয়াতে এমদাদিয়া, আহওয়ালে বরযখ ও বুশরাল ক্বারীব ইত্যাদি]

যিয়ারতের সুন্নাতসম্মত পদ্ধতি

যিয়ারতকারী ওযূ সহকারে যিয়ারত করা, যাতে নিজের জন্য ও মৃত ব্যক্তির জন্য কৃত দো'আ ক্ববূল হবার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আসার সময় মৃতব্যক্তির পায়ের দিক হতে আগমন করা, মাথার দিক থেকে নয়, যাতে কবরবাসী যিয়ারতকারীকে সরাসরি দেখতে পায়। অতঃপর ক্বেবলার দিকে পিঠ

করে কবরবাসীর প্রতি মুখ করে এতটুকু দূরে দাঁড়াবেন, যতটুকু দূরে জীবিত থাকতে দাঁড়াতেন। অতঃপর যিয়ারতের ক্ষেত্রে বর্ণিত সালাম পেশ করতে হবে। এরপর তিলাওয়াতে ক্বোরআন, দুরূদ শরীফ ও মুনাজাত করতে হবে।

[ফাতাওয়ায়ে শামী, লুম'আত ও শরহে মিশকাত]

উল্লিখিত পন্থায় সম্ভব না হলে যেভাবে সম্ভব হয় সেভাবে যিয়ারত করবেন।

কবরস্থানে গিয়ে পড়বেন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَآاَهْلَ الْقُبُوْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ اَنْتُمْ لَنَا سَلَفٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ وَاِنَّا اِنْشَآءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُتَقَدِّمِيْنَ مِنَّا وَالْمُتَأَخِّرِيْنَ نَسْئَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ وَيَرْحَمُنَا اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ -

অর্থাৎ হে কবরবাসী মুমিন-মুসলমান নর-নারীগণ! আপনাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আপনারা আমাদের পূর্ববর্তী, আর আমরা আপনাদের অনুসরণকারী। নিশ্চয় আমরা আপনাদের সাথে সাক্ষাতকারী, ইন্শা আল্লাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর রহমত নাযিল করুন, আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও আপনাদের জন্য শান্তি প্রার্থনা করি। আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের ক্ষমা করুন আর আমাদেরকে এবং বিশেষ করে আপনাদেরকে দয়া করুন।

আলোচ্য সালাম ও দো'আ মুসলিম শরীফ ও তিরমিযী শরীফের হাদীসের সমষ্টি। অতঃপর যতটুকু সম্ভব ক্বোরআনে পাক থেকে তিলাওয়াত করবেন। সম্ভব হলে নিম্নবর্ণিত সূরাসমূহ তিলাওয়াত করবেন। যেমন- সূরা ফাতিহা, সূরা বাক্বারার প্রথম থেকে 'মুফলিহূ-ন' পর্যন্ত, আয়াতুল কুরসী, সূরা বাক্বা-রার শেষে 'আ-মানার রসূল' থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত, সূরা ইয়া-সী-ন, সূরা মুল্ক, সূরা তাকা-সুর এবং ১১বার সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করবেন। [ফাতাওয়া-ই শামী]

যাদের এসব আয়াত ও সূরা কণ্ঠস্থ নেই, তারা যা জানে তা তিলাওয়াত করলেও চলবে। অতঃপর দুরূদ শরীফ পড়ে ঈসালে সাওয়াব করবেন। অর্থাৎ যা তিলাওয়াত করেছেন তার সাওয়াব সর্বপ্রথম নবীকুল শিরমণি হুযূর আক্রাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবা-ই কেরাম, আহ্লে বায়তে রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সকল নবী-রসূল, সকল নেক্বান্দা, আউলিয়া-ই কেরাম ও সকল ঈমানদারের রূহে পৌঁছাবেন।

যিয়ারতের মুনাজাত আরবী ভাষায় এভাবে বলবেন-

اَللّٰهُمَّ اَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُ مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالصَّلَوَاتِ وَالْكَلِمَاتِ الطَّيِّبَةِ

অর্তঃপর এ ক্ষেত্রে যদি দান-খয়রার্ত ও খাবার সামগ্রীর ব্যবস্থা হয় তাহলে এর সাথে বলবেন-

وَثَوَابَ مَاتَصَدَّقْتُ لَکَ مِنَ الْأَطْعَمَةِ وَالْأَشْرِبَةِ اِلٰی رُوْحِ نَبِیِّکَ وَحَبِیْبِکَ خَاتَمِ الْمُرْسَلِیْنَ وَشَفِیْعِ الْمُذْنِبِیْنَ اَحْمَدَ الْمُجْتَبٰی مُحَمَّدِنِ الْمُصْطَفٰی صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اِلٰی اَرْوَاحِ اٰلِهٖ وَاَرْوَاحِ اَصْحٰبِهٖ ثُمَّ اِلٰی رُوْحِ فُلَان...وَاِلٰی اَرْوَاحِ جَمِیْعِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَاِلٰی اَرْوَاحِ عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِیْنَ وَاِلٰی اَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِرَحْمَتِکَ یَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِیْن.

অতঃপর ক্বোরআন ও হাদীসে পাকে বর্ণিত দো'আ- মুনাজাত পাঠ করবেন, যদি জানা থাকে। অন্যথায় নিজের ভাষায় নিজের ও কবরবাসীর জন্য দো'আ করবেন। যদি নবী-ওলীর রওযা শরীফের যিয়ারত করেন, তাহলে তাঁদের উসীলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করবেন। এটা দো'আ ক্ববূলের সর্বাধিক কার্যকরী উপায়।

যিয়ারতের সময়

প্রত্যেক সপ্তাহে কবর যিয়ারত করা উত্তম (শামী)। সবচেয়ে উত্তম হল জুমু'আর দিন, শনিবার, সোমবার ও বৃহস্পতিবার। মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি' জুমু'আর দিন যিয়ারত করতেন। তাঁকে বলা হল, ''আপনি সোমবার যিয়ারত করলে ভাল হত।'' তখন তিনি বললেন, ''আমি হাদীস শরীফের মাধ্যমে অবগত হয়েছি যে, মৃতব্যক্তি যিয়ারতকারীকে জুমু'আর দিন ও তার একদিন আগে ও পরে চিনতে পারে।'' ইমাম ইবনে আবিদ্দুন্‌য়া ও ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলায়হিমা শু'আবুল ঈমানে মুহাম্মদ ইবনে ওয়াসি' থেকে উপরোক্ত হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন।

[খাসা-ইসি ইয়াওমিল জুমু'আহ, ৭৮পৃষ্ঠা, কৃত:ইমাম সুয়ূতী]

ইমাম ক্বুরত্ববী রহমাতুল্লাহি আলায়হি কোন আরিফ বান্দা থেকে বর্ণনা করেন যে, মৃতব্যক্তি বৃহস্পতিবার সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে শনিবার সূর্যোদয় পর্যন্ত যিয়ারতকারীকে চিনতে পারে। এ কারণে এ সময়ে যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেউ কেউ সোমবার দিবাগত রাতও উল্লিখিত সময়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।

হযরত দ্বাহ্হাক রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''যে ব্যক্তি শনিবার সূর্য উদয়ের পূর্বে কোন কবরের যিয়ারত করবে মৃতব্যক্তি তার যিয়ারত সম্পর্কে অবগত হবে।'' কেউ বলল, ''তা কিভাবে?'' তিনি উত্তরে বললেন, ''জুমু'আর দিনের মর্যাদার কারণে।'' [খাসা-ইসি ইয়াওমিল জুমু'আহ, ৭৮পৃষ্ঠা, কৃত:ইমাম সুয়ূতী]

আসলে যে কোন সময় সুযোগ মত কবর যিয়ারত করা জায়েয। তবে উল্লিখিত দিনগুলোতে করতে পারলে উত্তম। এ হিসেবে আমাদের দেশে জুমু'আর দিন নামাযান্তে যিয়ারত করার যে নিয়ম প্রচলিত তা শরীয়তের আলোকেও উত্তম।

বরকতময় দিবসসমূহে যিয়ারত

বৎসরের বরকতময় রাতসমূহে কবর যিয়ারত করা সুন্নাত; অর্থাৎ শবে বরাত, শবে ক্বদ্‌র ইত্যাদিতে কবর যিয়ারত করা। অনুরূপভাবে, দু'ঈদের দিনেও যিয়ারত করা সাওয়াবদায়ক।

হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''এক রাতে আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বিছানায় পেলাম না। খোঁজ করে দেখার পর তাঁকে 'জান্নাতুল বাক্বী'তে (মদীনা শরীফের কবরস্থান) পাওয়া গেল (সেটি ছিল শবে বরাত)। [মিশকাত শরীফ, পৃ. ১১৪]

আলোচ্য হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বরকতময় রজনীতে যিয়ারত করেছেন এবং উম্মতের গুনাহ্ ক্ষমার জন্য মহান রবের দরবারে দো'আ করেছেন।

মাতাপিতার কবর যিয়ারত

পবিত্র হাদীসের আলোকে, সন্তানের সবচেয়ে সদাচরণের পাত্র হলেন মাতাপিতা। তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের সাথে সদাচরণ হল সাধ্যানুসারে তাঁদের খেদমত করা এবং সামর্থ্যানুযায়ী তাঁদের আরামের ব্যবস্থা করা। মাতাপিতার মৃত্যুর পরও তাঁদের কিছু হক্ব সন্তানের উপর থেকে যায়। যেমন-

হযরত আবূ সা'ঈদ সা'ঈদী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমরা রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ছিলাম। হঠাৎ বনী সালিম গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, ''এয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাতাপিতার প্রতি সদাচরণের এমন কিছু অবশিষ্ট আছে কি, যা আমি তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের প্রতি আদায় করতে পারব?'' হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''হ্যাঁ, তাদের উভয়ের জন্য দো'আ করা, আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের ওয়াদাসমূহ পূরণ করা, তাঁদের ঘনিষ্টদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখা এবং তাদের বন্ধুদের সম্মান করা।'' [আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ শরীফ]

আলোচ্য হাদীসে মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দো'আ-ইস্তিগফার করা থেকে মাতাপিতার কবর যিয়ারতের গুরুত্বও প্রমাণিত হয়। হাকীম তিরমীযী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'নাওয়াদিরুল উসূল'-এ এবং ইমাম ত্বাবরানী 'আওসাত'-এ হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমু'আর দিন মাতাপিতা উভয়ের অথবা একজনের কবর যিয়ারত করবে, তাকে মাফ করে দেওয়া হবে এবং তাকেও (মাতাপিতার প্রতি) সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে পূণ্য দেওয়া হবে। [খাসা-ইসি ইয়াওমিল জুমু'আ, ৭৮পৃ., কৃত:ইমাম সুয়ূতী]

আলোচ্য হাদীসটি ইমাম বায়হাক্বী রহমাতুল্লাহি আলায়হি 'শু'আবুল ঈমান'-এ মুহাম্মদ ইবনে নু'মান থেকে বর্ণনা করেছেন। [মিশকাত শরীফ, ১৫৪পৃষ্ঠা]

অপর হাদীসে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ‘‘নিশ্চয় কোন বান্দা এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে যে, তার মাতাপিতা উভয়ের অথবা একজনের সে অবাধ্য। অতঃপর সে মাতাপিতা উভয়ের জন্য সময় সময় দো‘আ-ইস্তিগফার করে, অবশেষে আল্লাহ্ তাকে মাতাপিতার প্রতি সদাচরণকারী হিসেবে লিপিবদ্ধ করেন।’’ [মিশকাত শরীফ, ৪২১ পৃষ্ঠা]

আলোচ্য হাদীস শরীফ দ্বারা মাতাপিতার কবর যিয়ারতের গুরুত্ব ও উপকারিতা প্রমাণিত হয়।

সর্বসাধারণ মুসলমানদের কবর যিয়ারত

কবরবাসীর অবস্থা ও মর্যাদানুসারে যিয়ারতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ভিন্ন হবে, যা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এ হিসেবে সর্ব সাধারণ মুসলমানদের যিয়ারত হবে তাদের জন্য দো‘আ ও ইস্তিগফারের উদ্দেশ্যে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ‘‘নিশ্চয় মৃতব্যক্তি কবরের মধ্যে সাহায্যপ্রার্থী ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায়। ভাই, পিতা, মাতা ও বন্ধু-বান্ধবদের দো‘আর অপেক্ষায় থাকে। যখন মৃতব্যক্তির নিকট দো‘আ পৌঁছে তখন তা তার নিকট দুনিয়া ও দুনিয়ার সব কিছু থেকে প্রিয় হিসেবে বিবেচিত হয়। [বায়হাক্বী শরীফ]

আলোচ্য হাদীস শরীফে বর্ণিত অবস্থা নিশ্চয়ই সকলের জন্য নয়; বরং গুনাহগার মুসলমানদেরই এ অবস্থা হবে। কারণ নবী-ওলী ও কামেল ঈমানদারগণের জন্য তো কবর জান্নাতের টুকরা হবে। সুতরাং সর্বসাধারণ মুসলমানদের ক্ষেত্রে কবর যিয়ারত হল তাদের জন্য দো‘আ ও মাগফিরাত কামনা করা, যাতে আল্লাহ্ তা‘আলা অনুগ্রহ করে তাদের ক্ষমা করেন এবং কবর আযাব মাফ করে দেন। বস্তুতঃ যিয়ারত, ফাতিহা, সাদক্বা-খায়রাত ও ঈসালে সাওয়াব দ্বারা মুসলমানদের গুনাহ্ মাফ হয় এবং কবর আযাব লাঘব হয়।

নবী ও ওলীগণের যিয়ারত

আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের যিয়ারত হল তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং যিয়ারতকারীর পুণ্যার্জন। কারণ, ওফাতের পর তাঁদের রূহানী ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়। খোদা প্রদত্ত ওই ক্ষমতা দ্বারা তাঁরা কবর-জগতে উন্নত জীবন লাভ করেন। ওখানে ইবাদত করেন এবং সৃষ্টিকে সাহায্য করেন। ইমাম শাফে‘ঈ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, হযরত মূসা কাযেম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি’র কবর শরীফ দো‘আ ক্ববূল হওয়ার জন্য তিরিয়াক্ব (এক প্রকার পাথর যা বিষ চুষে নেয়) ও পরীক্ষিত। [হাশিয়া-ই মিশকাত, ১৫ পৃষ্ঠা]

হযরত ইমাম শাফে‘ঈ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হতে আরো বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হতেন, তখন ইমাম আবূ হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি’র মাযার শরীফে হাযির হতেন [শামী]। অনুরূপ হযরত গাউসুল আযম শায়খ সৈয়্যদ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহমাতুল্লাহি আলায়হি’র মাযার শরীফে গিয়ে ফয়য হাসিল করতেন। [যুবদাতুল আ-সা-র, কৃত: শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলভী]

অতএব, নবী-ওলীগণের রওযা শরীফ যিয়ারত ও ঈসালে সাওয়াব দ্বারা একদিকে যিয়ারতকারী বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়, অপরদিকে এতে আল্লাহর দরবারে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ জগতে যেমন গরীব দুঃখীদের কেউ দান করলে এতে তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটায় আর ধনীদের কেউ উপহার দিলে সেটা তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয় এবং তাদের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। অনুরূপ পরকালেও।

নবী-ওলীগণের যিয়ারতের ক্ষেত্রে আলোচ্য উদ্দেশ্যকে বর্তমানে এক শ্রেণীর লোক শির্ক বা বিদ‘আত হিসেবে আখ্যায়িত করে। অথচ তাদের পেশোয়াগণ এর শিক্ষা দিয়ে গেছেন। যেমন- দেওবন্দী ওহাবীদের পীর হাজী এমদাদুল্লাহ্ মুহাজিরে মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ‘‘হাদীয়ে আলম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম’র পবিত্র রূহে ফাতিহা পড়ে তাঁর রূহানিয়াত থেকে ইস্তিক্বামাত (অটলতা) অর্জন ও সাহায্য প্রার্থনা করবে।’’ [যিয়াউল কুলূব ও কুল্লিয়াতে ইমদাদিয়া, পৃষ্ঠা ৬৮]

তিনি ওই কিতাবের ৭২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন- ‘‘আউলিয়া ও মাশাইখের কবরসমূহের যিয়ারতের মর্যাদা লাভ করবে অবকাশের সময়। তাঁদের কবরসমূহে অন্তঃকরণে তাঁদের প্রতি মনোনিবেশ করবে। আর তাঁদের হাক্বীক্বতকে মুর্শিদের আকৃতিতে ধ্যান করে ফয়য হাসিল করবে।’’ এতে প্রতীয়মান হয় যে, আউলিয়া কেরামের মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্য হল তাঁদের রূহানিয়াত থেকে ফয়য-বরকত হাসিল করা।

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত

মহিলাদের জন্য কবর যিয়ারত জায়েয কিনা এ নিয়ে হাদীস ও ফিক্বহ্ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অনেকে বলেন যে, যিয়ারতের হুকুম শুধু পুরুষদের জন্য। কারণ, হাদীস শরীফে যিয়ারতকারীনীদের প্রতি অভিশাপ দেওয়া হয়েছে। [মুসনাদ-ই আহমাদ, তিরমীযী ও ইবনে মাজাহ শরীফ] তাঁরা বলেন যে, মহিলাদের জন্য যিয়ারত মাকরূহ। আবার অনেকে বলেন যে, আলোচ্য হাদীস যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পূর্বের। সুতরাং অনুমতির হাদীসে নারী-পুরুষ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। অতএব, মহিলাদের জন্য যিয়ারত জায়েয ও সুন্নাত। আবার অনেকে বলেন, মহিলাদের জন্য যিয়ারত মাকরূহ হওয়ার কারণ হল, তাদের ধৈর্যের স্বল্পতা ও ভয়-ভীতির আধিক্য; অর্থাৎ মহিলারা কবরস্থানে গেলে হয়তো আত্মীয়-স্বজনদের কবর দর্শনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়বে। সৃষ্টিগতভাবেই তো মহিলারা কোমলমনা। অনুরূপ তাদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় ভয়-ভীতিও বেশি।

আবার কেউ কেউ বলেন, মহিলাদের জন্য যিয়ারত তখন মাকরূহ হবে না, যখন তাদেরকে কেন্দ্র করে কোন ফিত্না ফ্যাসাদের সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণে কোন কোন ফক্বীহ্ যুবতীদের জন্য নিষেধ করেন এবং বৃদ্ধাদের জন্য জায়েয বলেন। অনুরূপ, কেউ কেউ বলেন, মহিলারা কোন প্রয়োজনীয় কাজে যাতায়াতের

পথে কোন কবরস্থান বা মাযার শরীফ থাকলে তার যিয়ারত করতে পারবে। এতে কোন অসুবিধা নেই। -[নাওয়াভী, শরহে মুসলিম, মিশকাত ও হাশিয়া-ই মিশকাত, ফতোয়া-ই শামী ও জামালুননূর ফী নাহয়িন্নিসা-ই 'আন্ যিয়ারাতিল ক্বুবূর, কৃত: ইমাম আহমদ রেযা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি]

উল্লেখিত আলোচনায় প্রত্যেক মতামতের পেছনে শরীয়তের দলীল ও যুক্তি রয়েছে। এসব দলীলভিত্তিক ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার আলোকে বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করলে মহিলাদের জন্য যিয়ারতের অনুমতি শর্তহীনভাবে দেওয়া যাবে না। কারণ, **প্রথমতঃ** মহিলারা যিয়ারতের শরীয়তসম্মত নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত নয়। **দ্বিতীয়তঃ** বর্তমানে মহিলাদের পর্দাহীনতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে; অথচ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আন্হা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কিছু কাপড় রেখে আমার ওই ঘরে প্রবেশ করতাম, যা'তে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম (রওযা শরীফে শায়িত) রয়েছেন। আর বলতাম, অসুবিধে কি? নিশ্চয় তিনি তো আমার স্বামী আর অপরজন হলেন আমার আব্বা (হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। দু'জনের মাযারই হযরত আয়েশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহার হুজরা শরীফে)। অতঃপর যখন তাঁদের সাথে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে দাফন করা হল, আল্লাহর শপথ! আমি আর কখনো এতে ওই অবস্থায় প্রবেশ করিনি- হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি লজ্জাবোধ করে। অর্থাৎ আমি সব কাপড় ভালভাবে পরেই প্রবেশ করতাম।[মিশকাত, ১৫৪পৃ]।

তিনি কবরে শায়িত ব্যক্তিকে লজ্জা করেছেন। আর বর্তমানের মহিলারা পাশে চলমান পুরুষকেও পরোয়া করছে না। **তৃতীয়তঃ** মহিলাদের দেখা যায় মাযার শরীফসমূহে যাওয়ার সময়ও সাজ-সজ্জা না করে যায় না। সুসজ্জিত হয়ে আকর্ষণীয় অবস্থায় যিয়ারতে গমন করা নিশ্চয়ই ফিত্না-ফ্যাসাদের কারণ হতে পারে। এমতাবস্থায় যিয়ারতে গমন করা সাওয়াবের স্থলে গুনাহ্ হবার আশঙ্কাই বেশি থাকে। সুতরাং কোন কোন ফক্বীহ্'র মতে মহিলাদের জন্য যিয়ারত জায়েয- যদি কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা না থাকে। এর ভিত্তিতে বলা যাবে যে, মহিলারা যদি পর্দা সহকারে যিয়ারতের নিয়মাবলী ও আউলিয়া কেরামের মাযারসমূহের শরীয়তসম্মত উপায়ে আদব রক্ষা করতে পারেন, তাহলে মহিলাদের জন্য যিয়ারত জায়েয হবে; অন্যথায় নয়। মহিলাদের জেনে রাখা উচিত, কোন সত্যিকার ওলী মহিলাদের জন্য তাঁদের দরবারে পর্দাহীন অবস্থায় আগমন ও শরীয়তের পরিপন্থী চাল-চলনকে আদৌ পছন্দ করেন না; বরং তা তাঁদের অসন্তুষ্টির কারণ হবে। এমতাবস্থায়ও তাঁদের রূহানী কৃপা কামনা করা বোকামী বৈ-কি। তাই অনেকেই মহিলাদের বেলায় কবর যিয়ারতকে মাকরূহ বলেছেন।

মাযার কর্তৃপক্ষেরও এ ক্ষেত্রে কিছু দায়িত্ব রয়েছে। তা' হল- প্রত্যেক মাযারে মহিলাদের জন্য পৃথক যিয়ারতের ব্যবস্থা করা এবং যিয়ারত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়

বিষয়াবলী মাযার প্রাঙ্গনে নির্দেশিকা হিসেবে টাঙ্গানোর ব্যবস্থা করা। অনুরূপভাবে, মাযার শরীফ প্রাঙ্গনে শরীয়ত পরিপন্থী কার্যাবলী রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারাহ্

হুযূর আকরাম সায়্যিদুল মুরসালীন রহমাতুল্লিল 'আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা পাকের যিয়ারত সর্বোত্তম মুস্তাহাব ও ইবাদতসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম। আবূ 'আমর বলেন যে, ইমাম ফাসী মালেকী যিয়ারতে মদীনাকে ওয়াজিব বলেছেন। হানাফী ফক্বীহ্ আল্লামা হাসান শারাম্বিলালী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, এটা ওয়াজিবের কাছাকাছি। আবার কোন কোন ফক্বীহ এটাকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ্ বলেছেন। কোন কনো 'মানাসিক'-এর কিতাবে সামর্থ্যবানদের জন্য মদীনা শরীফের যিয়ারত ওয়াজিব বলা হয়েছে। ইমামদের এ বিষয়ে ইজমা (ঐকমত্য) হয়েছে যে, রওযা-এ আন্ওয়ারের যিয়ারত একটা সম্পূর্ণ পৃথক ইবাদত। এটা অন্য কোন ইবাদতের আনুষঙ্গিক বিষয় নয়; বরং শুধু রওযা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই মদীনা শরীফ গমন করবে। এ কারণে ইমামগণ বলেন, যে ব্যক্তি শুধু রওযা-ই আন্ওয়ারের যিয়ারতের দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবে, সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্য রাখবে না, সে এক মহান ইবাদতে রত। এক নবীপ্রেমিক বলেন, ''মুবারকবাদ ঐ ব্যক্তির জন্য যে সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বার যিয়ারত করেছে, নিজের উপর থেকে তার বোঝা হালকা করেছে।'' আল্লামা শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী বলেন, যথাযথভাবে বুঝে নেয়া উচিত যে, হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর যিয়ারতের ইচ্ছা করা ও তাঁর মসজিদ শরীফে উপস্থিতি মাক্বূল হজ্জের সমান; বরং আদায়কৃত হজ্বের ক্বূলিয়াতের জন্য এটা ওসীলা হবে।[জাযবুল ক্বুলূব ইলা দিয়ারিল মাহবূব, নূরুল ইযাহ্, নূরুল ঈমান, পৃ. ৮৬/৮৭, তাহতাবী আলামারাক্বিল ফালাহ্]

এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীস শরীফ

এক. হযরত ইবনে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি হজ্ব করলো আর আমার যিয়ারত করলো না সে নিশ্চয় আমার প্রতি যুল্ম করলো।'' এ হাদীসটি 'সনদে হাসান'সহকারে বর্ণিত। (ত্বাহত্বাভী ও হাশিয়ায়ে নূরুল ঈযাহ, আল্-কামিল, কৃত: ইমাম ইবনে 'আদী, নূরুল ঈযাহ, শিফাউস্ সিক্বাম, কৃত: ইমাম সুবকী)

দুই. হযরত ইবনে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে তার জন্য আমার শাফা'আত ওয়াজিব হয়ে যাবে।'' (দারে ক্বুতনী, সহীহ ইবনে খুযাইমা, শু'আবুল ঈমান, নূরুল ঈযাহ, ত্বাহত্বাভী, আন্ওয়ারুল হারামাঈন, নূরুল ঈমান, কিতাবুল ঈযাহ্ ফিল মানাসিক, কৃত: ইমাম নাওয়াভী, শিফাউস্ সিক্বাম, কৃত: ইমাম সুবকী)। হাদীসের ইমামদের একদল আলোচ্য হাদীস শরীফকে সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। (নূরুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮৯)

তিন. হযরত হাত্বিব ইবনে আবী বালতা'আহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি আমার ওফাতের পর আমার যিয়ারত করলো, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার যিয়ারত করলো।''

[বায়হাক্বী, ইবনে আসাকির]

চার. হযরত ইবনে 'ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি মদীনা শরীফে আমার যিয়ারত করবে আমি তার সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।'' [শিফাউস্ সিক্বাম, কৃত: ইমাম তক্বীউদ্দীন সুবকী]

পাঁচ. হযরত 'ওমর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ''যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করবে আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।''

[মুসনাদে আবী দাউদ তায়ালিসী, ইবনে আসাকির, শিফাউস্ সিকাম]

ছয়. হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি শুধু আমার যিয়ারতের উদ্দেশ্যেই আমার রওযা পাকে আসবে, অন্য কোন প্রয়োজনে নয়, তখন আমার উপর কর্তব্য হয়ে পড়বে যেন আমি ক্বিয়ামত দিবসে তার জন্য সুপারিশকারী হই। [ত্বাবরানী মু'জামে কবীর, নূরুল ঈমান, কৃত: আল্লামা আবদুল হালীম লক্ষ্ণৌভী]

সাত. হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, হুযূর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ''যে ব্যক্তি সাওয়াবের উদ্দেশ্যে আমার যিয়ারত করবে, আমি তার জন্য সুপারিশকারী ও সাক্ষী হবো।''

[শিফউস্ সিক্বাম ফী যিয়ারাতে খায়রিল আনাম, পৃষ্ঠা ৩১]

মদীনা মুনাওয়ারায় রওযা-ই আক্বদাসের যিয়ারত, জান্নাতুল বাক্বী', মসজিদে ক্বুবা, শুহাদা-ই উহুদ ইত্যাদির যিয়ারতের নিয়ম ও এতদসংক্রান্ত দলীলাদি আলহাজ্ব মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান কর্তৃক লিখিত 'হজ্জে বায়তুল্লাহ্ ও যিয়ারতে মদীনা মুনাওয়ারা' (পূর্ণাঙ্গ সচিত্র হজ্জ গাইড)-এ দেখুন।

হযরত গাউসুল আযম ও গেয়ারভী শরীফ

গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নিজ পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, 'আবদুল ক্বাদির' আমার প্রসিদ্ধ নাম আর আমার নানাজান (মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম) আমার কামালিয়াতের ঝর্ণাধারার উৎস। আমি হাসানী-হুসাইনী সৈয়্যদ বংশে জন্মগ্রহণ করেছি। আর 'মাখ্দা' (বেলায়তের সর্বোচ্চ স্তর) আমার স্থান। আমার কদম মুবারক যাবতীয় লোক ও আউলিয়া কেরামের কাঁধের উপর। আমি 'মুহিউদ্দীন' (দ্বীনকে পুনঃর্জীবিতকারী), জীলানী। আমার মর্যাদা ও বুযুর্গীর পতাকা উঁচুগিরির চূড়ায় পতপত করে উড়ছে। আমি আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের এতই সান্নিধ্যে যে, তিনি আমাকে পরিচালিত ও উন্নতির পথ প্রদর্শন করছেন আর আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি আমাকে সমস্ত ক্বুত্বের সরদার করেছেন। আমার আদেশ সর্বাবস্থায় পালনীয় ও জারী থাকবে। খোদার রাজ্য আমার মালিকানায় এবং আমার হুকুমের তাঁবেদার। আল্লাহর নিখিল বিশ্ব আমার দৃষ্টিতে সর্ষে পরিমাণ।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এমন সূক্ষ্ম তত্ব ও হিকমত দান করেছেন যে, যদি আমি ওই সূক্ষ্মতত্ব ও গোপন রহস্যাদির একটি কণাও উত্তাল তরাঙ্গায়িত সাগর জলে নিক্ষেপ করি, তাহলে সাগরের পানি শুষ্ক হয়ে ভূগর্ভে নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি আমার গোপন ভেদ বা রহস্য পাহাড়ে নিক্ষেপ করি, তবে পাহাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বালিরাশির মাঝে লুপ্ত হয়ে যাবে। যদি অগ্নিপানে নিক্ষেপ করি, তবে অগ্নি নিভে শীতল হয়ে যাবে। যদি এ গোপন রহস্য মুর্দার উপর ছেড়ে দিই, তবে মহান আল্লাহ্র ক্বুদ্রতে সে জীবিত হয়ে তড়বড়িয়ে দাঁড়িয়ে যাবে।

উল্লিখিত বাণী ও বর্ণনাসমূহ সায়্যিদুনা গাউসে আ'যম মাহবূবে সুবহানী শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র জগতজোড়া 'ক্বসীদা-ই গাউসিয়া' থেকে নেওয়া হয়েছে। এ ক্বসীদার প্রতিটি পংক্তির ব্যাখ্যা একেক অতল সমুদ্রের ন্যায়, যা বড় বড় কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতঃ তিনি এ সমস্ত মর্যাদা লাভের পেছনে আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এবং বেলায়তের শাহান্শাহ্ হযরত আলী হায়দার রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র দানই রয়েছে; তাঁদের থেকে পাওয়া বেলায়তের আলোকবিম্ব গাউসে পাক স্বীয় জবানে প্রকাশ করেছেন মাত্র।

'আত্বা-ই ইলাহীর বর্ণনা

একদা মাদরাসা-ই গাউসুল আ'যমে ১৩জন উঁচুমানের পীর- দরবেশ হাযির ছিলেন। গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের উদ্দেশে বললেন,

---

* মূল ঃ আল্লামা আবু দাউদ মুহাম্মদ সাদেক রেজভী ও আল্লামা মুহাম্মদ জিয়াউল্লাহ্ ক্বাদেরী।
ভাষান্তর ঃ মাওলানা মুহাম্মদ নেজাম উদ্দীন

''আপনারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ অভাব অভিযোগ পেশ করুন, আমি তা পূরণ করবো।'' তাঁরা নিজ নিজ অভাব পেশ করার সময় নিম্নোক্ত আয়াত গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তিলাওয়াত করলেন- ''কুল্লান নুমিদ্দু হা---উলা----ই ওয়া হা---উলা----ই মিন আত্বা----ই রাব্বিকা।'' অর্থাৎ আল্লাহ্ এরশাদ করেন, ''আমি সবাইকে সাহায্য করি এদেরকে (যারা দুনিয়া চায়) এবং ওদেরকে (যারা পরকালের সুখ-শান্তি চায়)। হে হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়কা ওয়াসাল্লামা! আপনার প্রতিপালকের দান অবধারিত।'' [সূরা বনী ইসরাঈল, ২০আয়াত]

হযরত আবুল খায়ের রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন যে, আল্লাহরই শপথ! তারা যা কিছু প্রার্থনা করেছেন সবই গাউসে পাক থেকে পেয়েছেন।

[বাহ্জাতুল আসরার, পৃ ৩০; যুব্দাতুল আসার, পৃ ৮২]

উক্ত আয়াতখানা পাঠ পূর্বক গাউসে পাক মাওলার দরবারে সকলের অভাব পূরণের প্রার্থনা করে এ কথার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হির সমস্ত মান-মর্যাদা আল্লাহর দেওয়া দান। আর আল্লাহর দান ও অনুগ্রহের বদৌলতে তিনি সকলের সাহায্যকারী এবং গাউসুল আ'যম বা বেলায়তের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন হতে সক্ষম হয়েছেন।

আ'ত্বা-ই মুস্তফা : গাউসে পাক এরশাদ করেন, ৫২১ হিজরীর ১৬ শাওয়াল মঙ্গলবার যোহর নামাযের পূর্বে স্বপ্নে দেখলাম- রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলছেন, ''হে প্রিয় বৎস! জনসমক্ষে ওয়ায-নসীহত কেন করছো না?'' আমি বললাম- ''আমি একজন অনারব লোক। আরবের প্রখ্যাত আলিমদের সামনে কিভাবে বক্তব্য রাখবো?'' রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বললেন, ''মুখ খোল।'' আমি মুখ খুল্লে তিনি তাঁর থুথু মুবারক সাতবার আমার মুখে নিক্ষেপ করে বললেন, ''যাও লোকদেরকে নসীহত করো, আর তাদেরকে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা স্বীয় রবের দ্বীনের প্রতি আহ্বান কর।'' (এ ধরনের বর্ণনা 'জামালে মুস্তফায়ী', কৃত: সৈয়দ নসীরুদ্দীন হাশেমী-তেও বর্ণিত হয়েছে)।

আ'ত্বা-ই হায়দরী : অতঃপর আমি যখন নামায আদায় পূর্বক ওয়ায করতে বসলাম, তখন এত অধিক লোক উপস্থিত হল যে, মনে মনে ভয় পেলাম। ওই সময় হযরত 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে আমার সম্মুখে দেখতে পেলাম তিনি আমাকে বললেন, ''হে প্রিয়বৎস! ওয়াজ কেন করছো না?'' আমি বললাম, ''আমার ভয় করছে।'' আমার মুখ খুলতে নির্দেশ করলে তিনি আমার মুখে ছয়বার থুথু মুবারক নিক্ষেপ করলেন। আমি বললাম, ''সাতবার কেন দিলেন না?'' তিনি উত্তরে বললেন, ''রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি আদব বা সম্মান রক্ষার্থে সাত বার দিলাম্ না, যাতে তাঁর সমকক্ষ না হই।''[বাহ্জাতুল আসরার, ২৫পৃ.]

সন্দেহের অপনোদন

গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর যবান মুবারক থেকে নিঃসৃত উপরের বর্ণনা থেকে অনেক মাসআলার উত্তর আমরা পেয়ে থাকি। (যারা এ ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা

পোষণ করে থাকে তাদের বহু আপত্তির জবাবও তাতে রয়েছে।) যেমন-

১. হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাজার বছর পরের ঘটনা সম্পর্কেও জানেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে জীবিত ও মুখতারে কুল। আল্লাহর ইচ্ছায়, যেখানে ইচ্ছা তিনি প্রকাশ হতে পারেন। যাকে চান তিনি সাক্ষাৎ ও ফুয়ূযাত দানে ধন্য করতে পারেন।

২. তাঁর আদর্শের প্রতিনিধিত্বকারী মাহবূবে খোদা ও আউলিয়া কেরাম ইন্তিকালের পরও জীবিত এবং মানুষের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। যেমন- হযরত আলী রদ্বিয়াল্লাহু আনহু হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন।

৩. রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র প্রতি সম্মান ও আদবের খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। তাঁকে নিজের মত মানুষ বলা, বড় ভাইয়ের সমস্থানে দাঁড় করানো নিতান্তই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা। যেমনিভাবে এখানে হযরত 'আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রসূলে খোদার এত স্নেহের পাত্র হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাত বার থুথু দিলেন না, যাতে রসূলের সমকক্ষতার অবকাশ না থাকে।

৪. গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ন্যায় বিশ্বের দরবারে এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্বের বাণী- রসূল জীবিত, মুখতারে কুল, গায়েবের সংবাদদাতা ও সবজায়গায় হাযের-নাযের হওয়ার পক্ষে অকাট্য প্রমাণ। অধিকন্তু গাউসে পাক এরশাদ করেছেন, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম শুধু থুথু মোবারক দিয়ে ধন্য করেছেন তা নয়, বরং আমার যাবতীয় লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ স্বয়ং নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'ই করেন।[শরহে ফাতহুল গায়্ব]

তেমনিভাবে, একদা শায়খ খলীফা নামক আল্লাহর এক ওলী, যিনি প্রায় সময় রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'কে স্বপ্নে দেখে ধন্য হতেন, একদা রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নিকট আরয করলেন, ''হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তাঁর ক্বদম্ সমস্ত আউলিয়া কেরামের কাঁধের উপর।'' রসূলুল্লাহ্ বললেন, ''শায়খ আবদুল ক্বাদের সঠিকই বলেছে। আর তা হবে না কেন? আবদুল ক্বাদের হল ক্বুত্ব। আমি নবী নিজেই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকি।'' [বাহ্জাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ১০]

শায়খ, ক্বুত্ব ও গাউস'র ব্যাখ্যা

হযরত গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শায়খ, ক্বুত্ব ও গাউস-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, ''আশ্ শায়খু মান ইয়ুসা'ইদুশ্ শাক্বিয়্যা' অর্থাৎ প্রকৃতার্থে শায়খ তিনিই, যিনি দুর্ভাগাকে সৌভাগ্যশালী করে দেন।''[শরহে ফাতহুল গায়্ব, ২০পৃ.] আর 'ক্বুত্ব' ওই ব্যক্তিকে বলে, যিনি কামালিয়াতের সমস্ত পর্দা অতিক্রম করে এমন মর্যাদায় উত্তীর্ণ হন যে, তখন সমস্ত মর্যাদা তাঁর পদতলে থাকে। সৃষ্টিজগতের সমস্ত কিছু তাঁর অন্তঃকরণে উদ্ভাসিত হয়। আলমে গায়্ব ও শাহাদাতের সমুদয় সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বস্তুর হাক্বীকৃত জানতে ও বুঝতে সক্ষম। তিনি রাষ্ট্রের নেতা বা সর্দার নিয়োগ ও অপসারণ করতে (বেলায়তী শক্তিতে)

সক্ষম। যাঁর অনুচর বা সঙ্গী -সাথী কেউ দুর্ভাগা হতে পারে না। তাঁর মুরীদ বা ভক্তদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ। মানুষের শক্তি যেখানে শেষ, সেখানে তাঁর (বেলায়তের) শক্তির সূচনা মাত্র। [নুযহাতুল ফাত্বির, কৃত: মোল্লা আলী ক্বারী]। 'গাউস' শব্দের অর্থ প্রার্থনায় সাড়াদাতা। (যিনি অভিযোগ শ্রবণকারী, ক্ববূলকারী -গিয়াসুল লুগাত দ্র.)। 'গাউস' শব্দের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আল্লামা আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন- 'গাউসিয়াত' বেলায়তের এমন এক উচ্চতর মর্যাদা, যা লাভ করলে আল্লাহর আদেশে তিনি সৃষ্টিজগতের হুকুম ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত হন। [শরহে ফতহুল গায়ব, পৃষ্ঠা ১৭১]

তাহলে দেখুন, 'শায়খ', 'ক্বুত্ব', ও 'গাউস' এই তিনটি স্তর বেলায়তের যাবতীয় গুণাবলী, পরিপূর্ণতা, সৃষ্টিজগতের পরিচালনা ও দেখা-শুনার স্ব স্ব জায়গায় ও মর্যাদায় অটুট। সুতরাং যেহেতু বেলায়তের এই ত্রিবিধ গুণাবলীর ধারক একমাত্র গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, সেহেতু তিনি শুধু পীর'ই নন, বরং পীরান পীর, শায়খুল মাশাইখ, ক্বুত্ব্বুল আক্বত্বাব, গাউসুস্ সাক্বালাঈন ও গাউসুল আ'যমও। তাঁর বেলায়তের মর্যাদা ও গুণাবলী সত্যিই বর্ণনাতীত। আ'লা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সম্পর্কে কতই সুন্দর বলেছেন, ''হে গাউসে পাক আপনার মর্তবা কত যে উঁচু! বড় বড় শীর্ষস্থানীয় ওলীগণের মাথা মুবারক হতেও আপনার কদম অনেক ঊর্ধ্বে।''

ইজমা'-ই উম্মত

'শায়খ', 'ক্বুত্ব' ও 'গাউস' সম্পর্কে মোটামুটি জানার পর এ কথা জানতে হবে যে, তাঁকে 'গাউসুল আ'যম', 'গাউসুস সাক্বালাঈন' বলাতে যে সকল আইম্মা-ই কেরাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন তাঁদের বর্ণনা নিম্নে পেশ করা হল-

১. উপমহাদেশের মুহাদ্দিসীনে কেরামের মুরব্বী শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁকে 'ক্বুত্ববুল আক্বত্বাব', 'আল্ গাউসুল আ'যম', 'পীরান পীর' এবং 'গাউসুস সাক্বালাঈন' বলে সম্বোধন করেছেন।

২. ইমাম রব্বানী মুজাদ্দিদে আল্ফে সানী বলেন, ''সমস্ত ক্বুত্ব ও নুজাবার জন্য ফুয়ূযাত ও বারাকাত পাওয়ার একমাত্র ওসীলা বা মাধ্যম হলো, হযরত আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু। কেননা, এই ফুয়ূযাত ও বরকত তাঁর মাধ্যম ব্যতীত অন্য কারো দ্বারা লাভ করা মোটেই সম্ভব নয়। মুজাদ্দিদে আল্ফেসানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ''চন্দ্র যেমন সূর্য থেকে আলো নেয়, তেমনি আমিও গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ফুয়ূযাত হাসিল করি।''[মাকতূবাত, ৩য় খন্ড, ৩৪৮ পৃষ্ঠা]

৩. হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেছেন, ''হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় ক্বসীদা-ই গাউসিয়া শরীফে নিজ উচ্চ মর্যাদাসমূহের বর্ণনার মধ্য দিয়ে তিনি প্রেমাত্মার পরিচয় প্রকাশ করেছেন। তিনি স্বীয় ক্বর শরীফে জীবিত ও যেকোন কাজ করতে সক্ষম। আর প্রতি বৃহস্পতিবার গাউসে পাকের নামে ফাতিহা দেওয়া চাই।'' [ইনতিবাহ ফী সালাসিলে আউলিয়া-ইল্লাহ্, পৃষ্ঠা ২৫]

৪. হযরত মোল্লা 'আলী ক্বারী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ''হযরত গাউসে পাক ক্বুত্বগণের ক্বুত্ব এবং গাউসগণের গাউস।''-নুযহাতুল খাতের, কৃত: মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি

৫. আউলিয়া কেরামের বেলায়ত অস্বীকারকারী এগারজন দেওবন্দী আলিমের শ্রদ্ধাভাজন মুর্শিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির-ই মক্কী বলেন, ''উত্তাল সমুদ্রে একটি জাহাজ যখন পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার উপক্রম হল, তখন হুযূর গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বীয় শক্তি ও বাতেনী দৃষ্টির বদৌলতে একে নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করলেন।'' [শামায়েলে এমদাদিয়া]

৬. গায়রে মুক্বাল্লিদ, উলামা-ই দেওবন্দের পরম শ্রদ্ধেয় মওলভী ইসমাঈল দেহ্লভী বলেন, ''হযরত গাউসুস্ সাক্বালাঈন এবং হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্বশবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা- উভয়ের রূহে আক্বদাস তার পীর সৈয়্যদ আহমদ ব্রেলভীকে ফয়ূযাত দান করে ধন্য করেছেন।'' [সেরাতে মুস্তাক্বীম, পৃষ্ঠা ৩৭২]

৭. মৌলভী খলীল আহমদ আম্বেঠভী তার 'বারাহীনে ক্বাতিয়া'র ৯১ পৃষ্ঠায়, 'সেরাতে মুস্তাক্বীম'-এর ঘটনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, হযরত গাউসুল আ'যম এবং খাজা বাহাউদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলায়হিমা উভয়ে যখন জানতে পারলেন যে, সৈয়্যদ আহমদ সাহেবের মর্যাদা সুউচ্চে আর অনেক লোক তার মুরীদ বা ভক্ত হবে, এ জন্য তাঁরা উভয়ে তাকে ফুয়ূযাত দান করে ধন্য করেন।

মৌং গোলাম খান ফনডুবীর উস্তাদ মৌলভী হুসাইন আলী খান পাছরুবী লিখিত কিতাব 'বুলগাতুল হায়রান'-এর ৪পৃষ্ঠায় বড়পীরকে 'গাউসুল আ'যম' লিখেছেন। দেওবন্দীদের শায়খুত্ তাফসীর মৌলভী আহমদ আলী লাহোরী বর্ণনা করেন, আমাদের প্রত্যেকের উচিত যে, বৃহস্পতিবার বাদে এশা উচ্চস্বরে যিক্র করার পূর্বে ১১বার সূরা ইখলাস পাঠ পূর্বক হযরত গাউসুল আ'যম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র রূহ মুবারকে সাওয়াব পৌঁছানো। এটাই আমাদের গেয়ারভী।

['হাফত রোযাহ্-ই খোদামুদ্দীন', লাহোর, ১৮ ফেব্রুয়ারী, ৯ই জুন ১৯৬১ তারিখে প্রকাশিত]

পাঠকমহল চিন্তা করুন, উপরের উদ্ধৃতিগুলো দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, যারা আউলিয়া কেরামের বেলায়তকে অস্বীকার করে, তাদের শ্রদ্ধাভাজন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পর্যন্ত হুযূর সায়্যিদুনা গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নির্দ্বিধায় 'গাউসুস সাক্বালাঈন' ও 'গাউসুল আ'যম' হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন। এমনকি দেওবন্দী ওহাবী মতাদর্শীদের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের স্পষ্ট মত হলো যে, গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (দ্বীন ইসলামের) জাহাজ সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আর তাঁর হাজার বছর পর তাদের ভাষায় সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ও তার মুরীদদের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, এমনকি রূহানী দীক্ষাও দিয়েছিলেন। আর মৌলভী আহমদ আলীর মতানুযায়ী এ কথা স্পষ্ট হলো যে, উচ্চস্বরে যিক্র ও মাসিক গেয়ার্ভী শরীফের স্থলে প্রতি সপ্তাহে গেয়ার্ভী শরীফ বৈধ। যেহেতু তিনি গাউসুল আ'যম ও গাউসুস্ সাক্বালাঈন, সেহেতু তাকে 'পীরান পীর' এবং 'দস্তগীর' বলতেও কোন দোষ নেই।

কেননা, তিনি জিন ও ইনসানের যে কেউ তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে আশ্রয় চায়, তিনি তার সাহায্যে এগিয়ে আসেন এবং তার আবেদন মঞ্জুর করেন।

কুন্ ফায়াকুন'র মর্যাদায়

আল্লাহ্ তা'আলা আসমানী কিতাবগুলোয় এরশাদ করেছেন, ''আমি (আল্লাহ্)ই তোমাদের রব। আমি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের উপযোগী নয়। আমি যে বস্তুকে 'কুন্' বা 'হয়ে যাও' বলি তা- বলার সাথে সাথে হয়ে যায়। হে আদম সন্তান! তোমরাও যদি আমার ইবাদত করো (আমার আদেশ-নিষেধ পরিপূর্ণভাবে) মেনে চলো, তবে আমি (আল্লাহ্) তোমাদেরকে এমন শক্তি দেবো। যদি তোমরা কোন বস্তুকে 'কুন' বা 'হয়ে যাও' বলো, তবে তা' সাথে সাথে হয়ে যাবে।'' বস্তুতঃ আল্লাহ্ তা'আলা 'কুন্ ফায়াকূন'-এর এ মর্যাদা তাঁর অনেক নবী এবং ওলীগণকে দান করেছেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন, ''হে দুনিয়া! যে আমার আদেশ-নিষেধ মেনে নিয়ে আমার আনুগত্য স্বীকার করবে, তুমি তার হয়ে যাও।''[ফুতূহুল গায়ব, পৃষ্ঠা ৭৩-৮৩]

শায়খুল মুহাক্কিক্ব আল্লামা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত কথার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, ''যে আউলিয়া কেরামকে আল্লাহ্ এ মর্যাদা দান করেছেন, তাঁদের মধ্যে একজন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলেন গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু; যাঁর আবির্ভাবই সৃষ্টির জন্য আল্লাহর অনুগ্রহস্বরূপ, যাঁর আদেশ সমস্ত জিন-ইনসান, খলীফা, দেশনায়ক ইত্যাদির নিকট সর্বদা শিরধার্য।

মৃত জীবিত করা

আল্লাহ্ তা'আলার কৃপায় ও রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ 'কুন্ ফায়াকুন'র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন। তাই তিনি অনেক মৃতকে জীবিত করেছেন বলে প্রমাণ মিলে। দীর্ঘ ১২ বছরেরও অধিককাল এক বৃদ্ধার ছেলে বরযাত্রীসহ সমুদ্রে ডুবে মৃত্যু বরণ করলে তাঁর দো'আর বদৌলতে সে পুনরায় বরযাত্রীসহ জীবিত হয়ে ফিরে আসে। এটা এক সুপ্রসিদ্ধ ঘটনা, যা একজন কাফের প্রত্যক্ষ করে ঈমান এনেছে। এ প্রসিদ্ধ ঘটনা অনেক বড় বড় আলিম নিজ নিজ কিতাবে গুরুত্বের সাথে বর্ণনা করেন। যেমন- 'খুলাসাতুল ক্বাদেরিয়া' কৃত: শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহ্রাওয়ার্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি, 'সুলতানুল আযকার ফী মানাক্বিবে গাউসিল আবরার', 'গুলিস্তানে কেরাম' কৃত: মুফতী গোলাম মুহাম্মদ ক্বোরায়শী; 'মানাক্বিবে গাউসিয়া', কৃত: আল্লামা মুহাম্মদ সা'ঈদী ক্বাদেরী, 'দুর্‌রাতুদ্ দরানী', কৃত: মাওলানা ওবায়দুল্লাহ্ শরীফুত্ তাওয়ারীখ; 'তাকমিলায়ে রওযাতুর্ রায়াহীন', 'তারীখে শাহীনে ইসলাম', 'তাফসীরে নঈমী', 'তাফসীরে নববী', 'তাযকিরায়ে আহলে সুন্নাত', লাহোর, 'তাওযীহুল বায়ান', 'দুর্‌রুল 'আজাইব', 'কিতাবে গাউসুল আ'যম' ইত্যাদি কিতাবে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়।

মাশাইখ-ই আরবা'আহ্

আল্লামা নূরুদ্দীন আলী ইবনে ইউসুফ এবং আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইয়াহ্য়া হাম্বলী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি থেকে বর্ণিত, মাশাইখে ইরাক এবং তাঁর পূর্ববর্তী শতাব্দীর মাশাইখের মধ্যে চারজন ক্বুতুবে আউলিয়াকে 'মাশাইখ-ই আরবা'আহ' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে তাঁরা গর্ভজাত অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগাক্রান্তকে ভাল করতে সক্ষম এবং মৃতকে জীবিত করে থাকেন। ওই চারজন হলেন: শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী, শায়খ আলী বিন হায়তমী, শায়খ বাক্বা বিন বতূ এবং শায়খ আবূ সা'দ কায়লুভী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম। (বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ৬৩/১৩৫; ক্বালাইদে জাওয়াহির, পৃষ্ঠা ৩৭) বিশেষতঃ শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে স্বয়ং মাশাইখ আরবা'আহ'র মধ্যে শায়খ আবু সা'দ কায়লুভী বলেন, ''তিনি আল্লাহর হুকুমে অন্ধকে চোখ দান করতেন, কুষ্ঠ রোগীকে ভাল করতেন এবং মৃতকে জীবিত করতেন।''

[বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা ৬৩]

গাউসুল আ'যম বনাম পাদ্রী

উপরোল্লিখিত বরযাত্রীসহ বৃদ্ধার ছেলেকে ১২ বছর পর জীবিত করার ঘটনা ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটিতেও তাঁর মৃত জীবিত করার স্পষ্ট প্রমাণ মিলে।

একদা এক পাদ্রী দাবী করল যে, তাদের নবী আলায়হিস্ সালাম মুসলমানদের নবী থেকে অনেক গুণ শ্রেষ্ঠ। কারণ, তিনি মৃতকে জীবিত করতেন। এ কথা শুনামাত্র গাউসে পাক পাদ্রীকে বললেন, ''আমি নবী নই; বরং আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর একজন গোলাম মাত্র। আমি যদি মূর্দা জীবিত করতে পারি তবে, তুমি কি আমাদের নবীর উপর ঈমান আনবে?'' পাদ্রী হ্যাঁ বললে তিনি একটি পুরাতন কবর হতে এক মৃতকে জীবিত করে দেখালেন। খ্রিস্টান পাদ্রী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর শান ও হযরত গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র কারামত অবলোকন করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।[তাফরীহুল খাতির ফী মানাকিবে শায়খ আবদুল কাদের, পৃষ্ঠা ১৬]

মুরগী জিন্দা করা

মৃতকে জীবিত করার বর্ণনাপরম্পরায় গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র অন্য একটি প্রসিদ্ধ কারামত হল- ''এক বৃদ্ধার এক ছেলে গাউসে পাকের তত্বাবধানে ছিলো। একদা ছেলেটির মা দেখতে পেলো যে, তার ছেলে খাদ্য হিসেবে শুধু রুটি খাচ্ছে। বৃদ্ধা ভাবল এ জন্য ছেলেটি দুর্বল ও শীর্ণকায় হয়ে যাচ্ছে। সে গাউসে পাকের কাছে উপস্থিত হলে দেখতে পেলো যে, তিনি মুরগীর গোশ্ত আহার করছেন। বৃদ্ধা বলল, ''হুযূর! আপনি মুরগীর গোশ্ত খাচ্ছেন আর আমার ছেলেকে শুষ্ক রুটি খেতে দিয়েছেন!'' শুনা মাত্র তিনি মুরগীর হাড়গুলোকে একত্রিত করে তার উপর হাত দিয়ে বললেন, ''ওই সত্তার হুকুমে যিন্দা হয়ে যা, যিনি ধ্বংসশীল বস্তুকে জীবিত করতে সক্ষম।'' এটা তাঁর মুখ হতে বের হওয়ার সাথে সাথেই মুরগী জীবিত হয়ে বলতে লাগল, ''লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর

রসূলুল্লাহ্ ওয়াশ্ শায়খ আবদুল ক্বাদের ওলিয়্যুল্লাহ্।'' (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন মা'বূদ নেই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রসূল আর হযরত শায়খ্ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহ্র ওলী।) এ দৃশ্য দেখানোর পর গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বৃদ্ধাকে বললেন, ''যেদিন তোমার পুত্র এটা করতে সক্ষম হবে সেদিনই যা ইচ্ছা তা খেতে পারবে। এর আগে নয়।''[বাহ্জাতুল আসরার, ৬৫পৃ.; কালাইদে জাওয়াহির, ৩৭ পৃ.)

দেখুন! যেখানে সরকারে মদীনা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র গোলামদের এ মর্তবা বা মর্যাদা হতে পারে সেখানে আক্বা ও মাওলা রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র শান-মান ও মর্যাদা কত বেশি তা তো আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

গেয়ারভী শরীফ

গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ব্যক্তিত্ব, শান-মান ও মর্যাদা যেমন সারা মুসলিম বিশ্বের সাধারণ লোক থেকে আরম্ভ করে আউলিয়া কেরামের নিকট পর্যন্ত পরিচিত ও গ্রহণীয়, তেমনি তাঁর স্মরণে আয়োজিত 'মাসিক গেয়ারভী শরীফ'ও সবার নিকট প্রসিদ্ধ। তারপরও দেওবন্দী এবং নজদীরা বেলায়ত ও শানে গাউসিয়াতের বিরোধিতা করার সাথে সাথে তাঁর প্রবর্তিত গেয়ারভী শরীফ এবং মৃতের জন্য ফাতেহাখানির বিরুদ্ধে ঢাকঢোল পিটিয়ে হারাম ঘোষণা করার অপপ্রয়াসে সদা লিপ্ত। কেননা, গেয়ারভী শরীফে আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে সাথে গাউসে পাকের নামও নেওয়া হয়, বিধায় তাদের মতে তা হারাম বা অবৈধ। অথচ তাদের এ যুক্তি নিরেট ভ্রান্ত। তাই, গেয়ারভী শরীফের বৈধতার উপর বিভিন্ন জ্ঞানীগুণীদের অভিমত ও আলোচনার সারসংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হল-

এক. সুলতান আওরঙ্গজেব আলমগীর রাহমাতুল্লাহি আলায়হির ওস্তাদ হযরত মোল্লা জীবন রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ক্বোর্আন শরীফের আয়াত 'মা উহিল্লা বিহী লিগায়রিল্লাহ্'-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলেন, ''যদি জন্তু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নামে যবেহ্ করা হয় (যেমনিভাবে কাফিররা তাদের বোতগুলোর নামে উৎসর্গ করে থাকে) তবে তা হারাম, কিন্তু যদি 'বিসমিল্লাহ্', 'আল্লাহু আকবার' বলে পশু যবেহ করে থাকে তা হালাল। যবেহ্ করার পূর্বে অথবা যবেহের পর 'গায়রুল্লাহ্'র (আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো) নাম নিতে কোন দোষ নেই। 'হিদায়া' কিতাবেও এমনি বর্ণিত। এ থেকে বুঝা যায় যে, আউলিয়া কেরামের ওরসের জন্য যে পশু মান্নত করা হয় তা' আহার করা জায়েয। কারণ, পশু যবেহকালে গায়রুল্লাহর নাম নেওয়া হয় না; আল্লাহ্র নামই নেওয়া হয়। যদিও যবেহের পূর্বে তাদের নামে মান্নত করা হয়। [তাফসীরাতে আহমদিয়া, ২৯-৪৫ পৃষ্ঠা]

হযরত মোল্লা আহমদ জীবন রহমাতুল্লাহি আলায়হি'র সুযোগ্য ছেলে মোল্লা মুহাম্মদ 'গেয়ারভী শরীফ' প্রসঙ্গে বলেন, ''অন্যান্য আউলিয়া কেরামের ওরস বৎসরান্তে অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু গাউসে পাক রাহমাতুল্লাহি আলায়হি'র শান-মান ও

মর্যাদা ভিন্নতর, তাই বুযুর্গানে দ্বীন তাঁর ওরস প্রতি মাসে (গেয়ার্ভী শরীফ) করে থাকেন।''

দুই. শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি উক্ত আয়াতের তাফসীর বা অর্থ করতে গিয়ে বলেন, যেহেতু আউলিয়া কেরামের ওরসে পশু যবেহ্কালে আল্লাহ্র নাম নিয়ে যবেহ করা হয়, সেহেতু তা বৈধ। তাঁর থেকে বর্ণিত যে, হযরত মির্যা মাযহার জানে জানাঁ রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এরশাদ করেন, ''আমি একদা স্বপ্নে এক উঁচু স্থানে আউলিয়া কেরামকে মুরাক্বাবায় বসে থাকতে দেখলাম। তাঁদের মধ্যখানে হযরত খাজা নক্শবন্দী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি দু'জানু এবং হযরত জুনাইদ বাগদাদী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি হেলান দিয়ে বসে আছেন। অতঃপর তাঁরা সবাই উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। আমি এর কারণ জানতে চাইলাম। তখন একজন বললেন যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'কে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁরা সামনে যাচ্ছেন। অতঃপর সেখানে আমি হযরত ওয়াইসুল ক্বরনী রাহমাতুল্লাহি আলায়হিকেও দেখতে পেলাম। তারপর একটি ঘর দেখতে পেলাম যেখানে নূরের বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে। আর সমস্ত আউলিয়া কেরাম ওই ঘরে প্রবেশ করার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁদের একজন বললেন, ''আজকে গাউসুস্ সাক্বালাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ওরস মোবারক, তাই ওরসে পাকের উৎসবে হাযির হতে যাচ্ছি।'' [কালিমাত-ই তৈয়্যাবাত (ফার্সী), ৭৮ পৃষ্ঠা]

তিন. হযরত শাহ্ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি 'গেয়ার্ভী শরীফ' এর প্রসঙ্গে বলেন, ''ইরাকে গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রওযা মোবারকে মাসের ১১ তারিখে দেশের বাদশাহ ও গণ্যমান্য লোকজন উপস্থিত হন। আর আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তিলাওয়াতে ক্বোর্আন, ক্বসীদাহ্ এবং জীবনী আলোচনা হতো এবং মাগরিবের পর হতে উচ্চস্বরে যিক্র করা হতো, অতঃপর মীলাদ শরীফ শেষে তাবার্রুক বিতরণ করে এশার নামায আদায়ের পর লোকেরা বিদায় হতো।''

[মালফুযাতে আযীযী (ফার্সী), ৬২ পৃষ্ঠা]

চার. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ''ইমামে আরেফ শায়্খ-ই কামিল আবদুল ওহাব ওরসে গাউসিয়ার নিয়মিত আয়োজন করতেন। আসলে গেয়ারভী শরীফের এ সিল্সিলা আমাদের দেশের পীর-বুযর্গদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। পরবর্তী কতেক আলেমে দ্বীন বলেছেন যে, আউলিয়া কেরামের ওফাত দিবসে মর্যাদা, বরকত ও ফুয়ূযাত লাভের মোক্ষম সুযোগ রয়েছে, যা অন্যান্য দিবস থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। তাই তাঁদের ওফাত দিবসে ক্বোর্আন খতম, ওরস, গেয়ারভী শরীফ ইত্যাদি ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে অতি যত্নের সাথে পালন করা হয়ে থাকে।''

[মা সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্, পৃষ্ঠা ১২৪, কৃত: শায়খুল মুহাক্কিক]

বিশ্ববিখ্যাত ওলী হযরত শায়খ আমান পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সম্পর্কে বলেন, ''তিনি রবীউস্ সানীর ১১ তারিখ ওরসে গাউসুস্ সাক্বালাঈন অনুষ্ঠান করতেন।'' (আখবারুল আখয়ার)। শাহ্জাদা দারা শিকওয়া 'সাফীনাতুল আউলিয়া', হযরত শাহ্ মু'আলী 'তোহফায়ে ক্বাদেরিয়া', মুফতী গোলাম সরওয়ার লাহোরী 'খযীনাতুল আসফিয়া' প্রভৃতি গ্রন্থে ওরস ও গেয়ারভী শরীফ পালন করার প্রসিদ্ধ ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন।

পাঁচ. মৌলভী ইসমাঈল দেহ্লভী (আহলে হাদীস ও দেওবন্দীদের গুরু) লিখেছেন যে, চিশ্তিয়া তরীক্বার ওলীগণের নামে ফাতিহা পাঠ করে দো'আ করা চাই। [সেরাতে মুস্তাক্বীম, ২৫৭]

চিশতিয়া তরীক্বার বুযর্গদের নামে ফাতেহা দেয়া উচিত হলে গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নামে ফাতেহা বা গেয়ারভী শরীফ করলে অসুবিধা কিংবা ক্ষতিই-বা কী?

ছয়. ওলামায়ে দেওবন্দের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ বলেন যে, মাসের ১১ তারিখে গেয়ারভী শরীফ পালন হযরত গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ঈসালে সাওয়াব করার নিয়মই। [ফায়সালায়ে হাফ্ত মাসআলা, ১২ পৃষ্ঠা]

সাত. মৌলভী হুসাইন আহমদ মদনীর অভিমত হলো- গেয়ারভী শরীফের খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে যদি এই নিয়্যত হয় যে, এর একটি অংশ ঈসালে সাওয়াবের জন্য, অপরাংশ পরিবার-পরিজন, বন্ধু- বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, তবে তা ফক্বীর ও গরীব লোক ব্যতীত অন্যদের জন্যও বৈধ।[মাকতুবাতে শায়খুল ইসলাম, ১ম খণ্ড, ২৮১পৃষ্ঠা]

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত- বৃহস্পতিবার রাতে উচ্চস্বরে যিক্র করার পূর্বে এগার বার সূরা ইখলাস পাঠ করে গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রূহ মোবারকের উপর সাওয়াব পৌঁছিয়ে দেওয়া। এটাই আমাদের গেয়ারভী শরীফ।

[দেওবন্দী হাফ্ত রোযাহ্, লাহোর থেকে প্রকাশিত, ৭ ফেব্রুয়ারী ৯ জুন ১৯৬১ইং]

গেয়ারভী শরীফ তথা ওরস অস্বীকারকারীদের অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে- কাক খাওয়া শুধুমাত্র বৈধ নয়, বরং সাওয়াব বা পুণ্যও বটে। তেমনিভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মূর্তিপূজা অনুষ্ঠানে মূর্তিগুলোর জন্য উৎসর্গিত প্রসাদ ইত্যাদি খাওয়া বৈধ এবং হিন্দুদের সুদের টাকা দিয়ে ক্রয়কৃত কূপ থেকে পানি পান করতেও কোন অসুবিধা নেই। (আল্লাহ্ আমাদেরকে আশ্রয় দিন।)

[ফাতাওয়া-ই রশীদিয়া, কৃত: রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, ২৭৪-২৯৪পৃষ্ঠা]

প্রকৃত বিচারক ও দ্বীনদাররা দেখুন ও চিন্তা করুন, যে সকল বস্তু ইমামের মতে হারাম, এমন বস্তুকে তারা হালাল হিসেবে ফাত্ওয়া দিল। আর গেয়ারভী শরীফ বা ওরস শরীফের হাজারো বৈধতা থাকা সত্ত্বেও তাকে হারাম বলে আখ্যায়িত করল; অথচ তাদের মতে কাকের মাংস ও হিন্দু সম্প্রদায়ের উৎসবে প্রতিমার নামে উৎসর্গকৃত বস্তু খাওয়াও হালাল! (না'ঊযু বিল্লাহ্, আমরা এ সব বাতিলের মতবাদ পোষণ করা থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ্ চাই।) বস্তুতঃ এসব অদ্ভুত ফাতওয়া

দিয়ে তারা নিজেরাই পথচ্যুত হয়েছে এবং অপরকেও পথচ্যুত করার পাঁয়তারা করছে।

'শাইআল্ লিল্লাহ্' বলা শির্ক নয়

দেওবন্দীদের মুরব্বী মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ফাত্ওয়া দিয়েছেন যে, 'এয়া শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী শাইআল্ লিল্লাহ্' পাঠ করা ওই সময় শির্ক হবে, যখন 'শায়খ'কে স্বেচ্ছায় স্বীয় শক্তি প্রয়োগে স্বাধীন মনে করা হবে; কিন্তু যখন এভাবে বলা হবে যে, শায়খকে আল্লাহ্ তা করতে শক্তি দেন এবং আল্লাহর হুকুমে শায়খ মানুষের প্রয়োজন পূরণ করে থাকেন, তখন শির্ক হবে না। (বস্তুতঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, আউলিয়া কেরাম খোদা প্রদত্ত শক্তিবলে সাহায্য করে থাকেন।) আর পড়ার সময় এটা বিশ্বাস করা যে, উক্ত দো'আয় বরকত ও প্রভাব রয়েছে (যেমনিভাবে কোন কোন মাশাইখে ক্বাদেরিয়া আমল করে থাকেন), না কুফুরী হবে, না ফাসিক্বী হবে। কোন মুসলমানকে কাফির, মুশরিক ও ফাসিক্ব ধারণা করা যাবে না, যতক্ষণ না তার উক্তিকে ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাখ্যা করে যদি তাতে কুফরের কিছু পাওয়া না যায়, তবে তাকে তো মুসলমানই বলা হবে। তারপরও মন্দ ধারণা করা নিজেকে নিজে গুনাহ্গার বানানো বৈ কি।

[ফাতাওয়া-ই জাওয়ায, পৃষ্ঠা ২৪; ফাতাওয়া-ই রশীদিয়া, পৃষ্ঠা ৩৪০]

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা বিবেকবান লোক সত্য-মিথ্যা পার্থক্য করতে সক্ষম হবেন বলে মনে করি; আল্লাহই একমাত্র তাওফীকদাতা। আ-মীন।

গেয়ারভী শরীফের বৈধতার প্রমাণ

প্রকৃতপক্ষে গেয়ারভী শরীফ কোন নতুন অনুষ্ঠান নয়, বরং হযরত মাহবূবে সুবহানী, ক্বুত্বে রব্বানী গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র রূহে আক্বদাসে ঈসালে সাওয়াব করার নামান্তর। বস্তুতঃ ঈসালে সাওয়াব (মৃতের রূহে সাওয়াব পৌঁছানো)'রও বৈধতার পক্ষে ক্বোর্আনুল করীম, হাদীসে নবভী এবং সালফে সালিহীনের কিতাবে দিবালোকের মত স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে কিছু বর্ণনা করা গেলো-

ক্বোর্আনের দলিল ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন-

وَالَّذِيْنَ جَآءُ وْا مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا
وَلِاِخْوَنِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَان

অর্থাৎ যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, ''হে আমাদের রব! আমাদেরকে এবং ঈমানে আমাদের অগ্রণী ভাইদেরকে ক্ষমা করো।''[সূরা হাশর, আয়াত ১০] আরো এরশাদ করেন- যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা সেটার চতুর্পাশে ঘিরে আছে, তারা তাদের রবের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আর মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে বলে, ''হে

আমাদের রব! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী, অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা করো।'' [সূরা মুমিন, আয়াত ৭]

উক্ত আয়াত দু'টি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পরবর্তীরা পূর্ববর্তীদের জন্য দো'আ, দান-খায়রাত তথা ঈসালে সাওয়াবের আয়োজন করা বৈধ।

হাদীস শরীফের আলোকে ঃ প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদুর্ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মহান দরবারে আরয করা হলো, ''এয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা আমাদের মৃত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে সাদক্বা ও হজ্জ করছি। এটা কি তাদের নিকট পৌঁছবে?'' তখন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, ''হ্যাঁ, নিশ্চয় তাতে তারা (মৃতগণ) খুশি হয়, যেমনিভাবে তোমরা পরস্পরকে উপঢৌকন প্রদান করলে খুশি হয়ে থাকো।''

[তাযকিরাতুল মাওতা ও শরহুস্ সুদূর, কৃত: হযরত জালালুদ্দীন সুয়ূতী]

সাল্ফে সালেহীনের অভিমত ঃ শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়্হি বলেন,''আর্থিক ইবাদত বা যাকাত-ফিতরা, সাদক্বা ইত্যাদি দ্বারা মৃত ব্যক্তির উপকার হওয়া ও সাওয়াব পাওয়ার ব্যাপারে সমস্ত ইমামগণ একমত।'' [জামেউল বারাকাত, মাসাইলে আরবা'ঈন, পৃষ্ঠা ৩]

সায়্যিদুনা ইমাম আ'যম আবূ হানীফা রাহ্মাতুল্লাহি আলায়্হি ইমাম আহ্মদ এবং অধিকাংশ সালাফ-ই সালিহীন'র অভিমত হচ্ছে প্রত্যেক ইবাদতের সাওয়াব মৃতের নিকট পৌঁছে থাকে (শর্হে ফিক্হে আকবার)। কাযী সানাউল্লাহ্ পানিপথী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, বেশিরভাগ ফক্বীহ'র মতে প্রত্যেক ইবাদতের সাওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছে থাকে (তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল্ ক্বুবূর)। শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ''ফাতিহা পাঠপূর্বক সাওয়াব মৃতের রূহে পৌঁছানো প্রকৃতার্থে বৈধ।'' [ফতোয়ায়ে আযীযী, পৃষ্ঠা ৭১]

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! ঈসালে সাওয়াবের বৈধতার উপর এতক্ষণ ক্বোর্আন, হাদীস্ এবং সালাফ-ই সালিহীনের স্পষ্ট অভিমত প্রকাশ্য ও মজবুত প্রমাণ পেশ করা গেল। এখন ঈসালে সাওয়াব অস্বীকারকারীদের বড় বড় আলিমদের গ্রন্থ থেকে দলীল নিম্নে পেশ করা গেলো-

এক. ইসমাঈল দেহ্লভী বলেন, ''যখন মৃতের জন্য কোন লাভ বা উপকার করার কারো ইচ্ছে হয়, তখন খানাদানার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো, অন্যথায় সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস পাঠপূর্বক সাওয়াব প্রেরণ করাই উত্তম।'' [সেরাতে মুস্তাক্বীম, পৃষ্ঠা ৬৪]

দুই. মৌলভী আশরাফ আলী থানভী লিখেছেন, ''প্রত্যেকে স্বীয় আমল যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারে, চাই মৃত হোক কিংবা জীবিত হোক। যেভাবে মৃতের নিকট সাওয়াব পৌঁছতে পারে তেমনি জীবিতদের নিকটও পৌঁছতে পারে।''

[আত্ তাযকীর, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫]

তিন. মৌলভী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর অভিমত হচ্ছে, ''মৃতের নিকট সাওয়াব পৌঁছানো হাদীস এবং অধিকাংশ সাহাবা-ই কেরাম ও ইমামগণ দ্বারা প্রমাণিত।''

[তাযকিরাতুর্ রশীদ, ২৬ পৃষ্ঠা]

আসলে ঈসালে সাওয়াব গুনাহ্র ক্ষমা এবং দারাজাত বুলন্দীর কারণ। হাদীসে পাকে গায়্বের সংবাদদাতা নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম এরশাদ করেছেন, ''যখন জান্নাতে আল্লাহ্ তাঁর বান্দার মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেন, তখন বান্দা আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞেস করে, ''হে আল্লাহ্! আমার এ মর্যাদা কিভাবে মিলেছে?'' তখন আল্লাহ্ বলেন, ''তোমার ছেলের তোমার জন্য গুনাহ্ ক্ষমা প্রার্থনার বদৌলতেই এ মর্যাদা পেয়েছো।'' [মিশকাত, ২০৬ পৃষ্ঠা]

''নিশ্চয় জীবিতদের দো'আ এবং মৃতের জন্য সাদক্বা দেওয়া তার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য বড়ই উপকারী।''[আক্বীদা-ই মুহাম্মদী, ২য় খণ্ড, পৃ৫২]

সুতরাং, এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে যে, হযরত গাউসুল আ'যম এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের দয়া ও ইহসান মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর খুব বেশি। এ জন্য আহ্লে সুন্নাত ওয়া জামাতের ওলামায়ে কেরামও গেয়ারভী শরীফ এবং ওরস শরীফের মত বরকতময় মাহফিলের প্রবর্তন করে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রিয় রসূলের ওসীলায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে প্রার্থনা করার ব্যবস্থা করে গেছেন। দো'আ করার সময় আউলিয়া কেরামের নামের প্রতি সম্বোধন করা হাদীসে পাক দ্বারা প্রমাণিত। যেমন- হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এক কাফেলাকে মসজিদে এশার নামাযে অতিরিক্ত দু'/চার রাক্'আত নামায পড়তে বলেন এবং ''এ নামাযের সাওয়াব যেন আবূ হুরায়রা পায়' এ বলে দো'আ করতে বলেন।''

[মিশকাত, ৪৬৮ পৃষ্ঠা]

হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাতা ইন্তিকাল করলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে তা আলোচনা করা হয় এবং তার জন্য উত্তম সাদক্বাহ্ কি করবো তা' জিজ্ঞাসা করলে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম পানির ব্যবস্থা করতে বলেন। হযরত সা'দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু একটি কূপ খনন করে বলেন, ''হাযা লিউম্মি সা'দ'' অর্থাৎ এ কূপ সা'দের মায়ের মাগফিরাতের জন্য। [মিশকাত, ১৬৯পৃষ্ঠা, আবূ দাউদ ও নাসাঈ শরীফ]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দু'টি ক্বোর্বানী করলেন, একটি নিজের পক্ষ থেকে, অন্যটি উম্মতের পক্ষ থেকে। [মুসলিম শরীফ, ২য় খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা]

পাঠকবৃন্দ, লক্ষ্য করুন, উল্লিখিত হাদীস শরীফ দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, কোন ভাল কাজের সাওয়াব অন্যের নামের দিকে সম্বন্ধ করা বৈধ। এখন এ প্রসঙ্গে সাল্ফে সালিহীন ও ওলামায়ে কেরামের অভিমত পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

এক. শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহমাতুল্লাহি আলায়্হি বলেন, ''আউলিয়া কেরামের মধ্যে কারো ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে দুধ, চাল বা যে কোন হালাল বস্তু রান্না করে তাতে ফাতেহা পাঠ করতে অসুবিধার কোন কারণ নেই; বরং এটা বৈধ।'' [ফতোয়ায়ে আযীযী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯]

হযরত ইমাম হাসান ও হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা'র ফাতিহাখানীর উদ্দেশ্যে রান্নাকৃত খানাপিনায় সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস এবং দরূদ শরীফ পাঠ করালে বরকতময় হয়ে যায় আর ওই খানা অত্যন্ত উত্তম। [ফতোয়ায়ে আযীযী, ১ম-৭১]

দুই. শাহ্ওয়ালী উল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহ্লভীর সম্মানিত পিতা হযরত শাহ্ আবদুর রহীম মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি প্রতি বছর বারই রবীউল আউয়াল শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র জন্য ফাতেহার আয়োজন করতেন। [আন্ফাসুল আরিফীন, পৃষ্ঠা ৪১; দুর্‌রুস্ সমীন, পৃষ্ঠা ৭]

কোন ভালকাজ মৃতের প্রতি সম্পৃক্ত করার বৈধতাকে যারা অস্বীকার করে তাদের মধ্যে ইসমাঈল দেহ্লভী অন্যতম। অথচ তিনি অন্যস্থানে বর্ণনা করেছেন যে, নামাযে তাশাহ্হুদ পড়াকালে বৈঠকের মত দু'জানু হয়ে বসে চিশ্তিয়া তরীক্বার বুযুর্গানে দ্বীন তথা খাজা আজমিরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি, খাজা ক্বুত্বুদ্দীন বখতিয়ার কাকী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি ইত্যাদির নামে ফাতিহা পাঠপূর্বক তাঁদের ওসীলা নিয়ে আল্লাহ্র দরবারে দো'আ করা চাই।'' [সেরাতে মুস্তাক্বীম, পৃষ্ঠা ১১]

সুতরাং গাউসে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর ওরস উপলক্ষে আয়োজিত খাবারের ব্যবস্থা এবং ভালকাজ করার সাওয়াব আউলিয়া কেরামের প্রতি পৌঁছানোর বৈধতার পক্ষে জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য এতটুকু দলিলই যথেষ্ট। আউলিয়া কেরামের প্রতি সম্বোধন করা মানে তাঁদের পবিত্র আত্মায় ঈসালে সাওয়াব করা।

ওরস উপলক্ষে দিন-তারিখ নির্ধারণ করা

আহলে সুন্নাত ওয়া জামাতের মতে, ওরস ইত্যাদির জন্য দিন-তারিখ নির্ধারণ করা জরুরী নয়; বরং আহ্লে হক্বের মতে, যে কোন সময় ফাতিহাখানি, ওরস করা বৈধ। কিন্তু সকল লোক যাতে সহজে ওরসে উপস্থিত হতে পারে, সে জন্য তারিখ নির্ধারণ করতে কোন দোষ নেই। যেমন বিরুদ্ধবাদীদের অন্যতম সম্মানিত পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ্ মুহাজির মক্কী বলেন, ওরসের ক্ষেত্রে তারিখ ও দিন নির্ধারণের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হলো, সিলসিলার সমস্ত লোক একই দিনে হাযির হতে পারা। ফলে পরস্পর দেখা-সাক্ষাতেরও সুযোগ হয়ে যায়। ক্বোর্‌আনখানি এবং খানাপিনার যা ব্যবস্থা হয়েছে তার সাওয়াব আউলিয়া কেরামের পবিত্র আত্মায় পৌঁছানো যায়। বস্তুতঃ দিন নির্ধারণ করা সকলের জন্য কল্যাণকরই বটে। [ফায়সালা-ই হাফ্ত মাসাইল, পৃষ্ঠা ৮]

তেমনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম কোন্ দিন ওয়াজ-নসীহত করবেন এবং নফল রোযা রাখবেন বা সফর করবেন তা নির্ধারণ করতেন।

[বোখারী, ১ম/৩৬ পৃ.; মিশকাত, ১ম/১০১পৃ.।

আল্লাহ্ পাক মানুষের আমলনামা তাঁর দরবারে পেশ করতে বৃহস্পতিবার দিনকে নির্ধারণ করেছেন। [আদাবুল মুফরাদ, ৪৭ পৃষ্ঠা] গেয়ারভী শরীফ বড় বড় আউলিয়া কেরাম উদ্‌যাপন করতেন কি, করতেন না, তার উপর একটি সূচি নিম্নে তুলে ধরা হল ঃ

গেয়ারভী শরীফের বৈধতা প্রসঙ্গে

হযরত গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র স্মরণে আয়োজিত 'গেয়ারভী শরীফ' অনুষ্ঠান শুধু পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে, তা' নয়; বরং এর প্রচলন অনেক যুগ পূর্ব থেকে বুযর্গান-ই দ্বীন করে আসছেন। যার প্রমাণ দিতে গিয়ে পাক-ভারত উপমহাদেশের অন্যতম মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভী রাহ্মাতুল্লাহি আলায়হি বলেন, ''নিশ্চয় উপমহাদেশে আজকাল ওরসে গাউসে পাক তথা গেয়ারভী শরীফের জন্য ১১ তারিখই প্রসিদ্ধ। বস্তুতঃ এই তারিখটি ভারতের পীর-মাশাইখের নিকট বেশি প্রসিদ্ধ। আর শায়খ আবদুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহ্লভীর ওস্তাদ এবং পীর ইমাম আবদুল ওহাব মুত্তাক্বী মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ও তাঁর পীর সাহেব এই তারিখে গেয়ারভী শরীফের খতম আদায় করতেন।'' [মা- সাবাতা বিস্ সুন্নাহ্, ১২৪ পৃষ্ঠা]

উপ-মহাদেশের মুহাদ্দিসগণের উস্তাদ শাহ্ আবদুল আযীয মুহাদ্দিস দেহ্লভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি গেয়ারভী শরীফ বাগদাদে সরকারীভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার বৈধতা প্রসঙ্গে বলেন, ''হযরত গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র মাযার শরীফে মাসের ১১ তারিখে দেশের সুলতান বা শাসক এবং শহরের বড় বড় গণ্যমান্য লোক হাযির হতেন। আর আসর নামাযের পর মাগরিব পর্যন্ত ক্বোর্‌আন্ তিলাওয়াত, গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র শানে ক্বসীদা পাঠ ও জীবনী আলোচনা করতেন এবং মাগরিবের পর দরবারের সাজ্জাদানশীন পীর উপস্থিত হতেন। উচ্চ আওয়াজে যিক্‌র-আয্‌কারের পর মাহফিল শেষ হতো এবং যা তাবার্‌রুক আসতো তা বিলি বন্টন করা হতো। [মালফুযাতে আযীযী, পৃষ্ঠা ৬২; ফার্সী]

পরিশেষে, উপরোল্লিখিত দীর্ঘ আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হচ্ছে যে, বর্তমানে প্রচলিত 'গেয়ারভী শরীফ' যুগের কোন নতুন আবিস্কার নয়; বরং এটা সাল্ফে সালিহীন ও বুযর্গান-ই-দ্বীনের প্রবর্তিত নিয়ম-নীতিমালার উপরই প্রতিষ্ঠিত। আর বুযুর্গান-ই দ্বীনের পছন্দনীয় কাজের উপর আমল করা প্রিয় রসূলের আদেশও বটে। যেমন, ''যে বস্তু মুসলমান বান্দাগণ ভাল মনে করে তা আল্লাহ্র দরবারেও ভাল বলে পরিগণিত।''

সুতরাং, সাইয়্যিদুনা গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র স্মরণে আয়োজিত গেয়ারভী শরীফ এবং ওরস শরীফ আয়োজকদেরকে মুশ্‌রিক এবং তাদের আয়োজনকে হারাম বলে ফাতওয়া দেয়া নিতান্তই পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতার পরিচয় বৈ আর কী হতে পারে?

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র ওসীলায় প্রত্যেককে বুঝার ও আমল করার শক্তি দান করুন, আ-মীন। বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

تَـــــــــمَّتُ بالخَيـــــــــرِ